শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

দাখিল

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টিকাদান কর্মসূচির সফল
বাস্তবায়নের জন্য 'ভ্যাকসিন হিরো' পুরস্কার গ্রহণ করছেন।

বাংলাদেশের টিকাদান কর্মসূচিতে সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ভ্যাকসিন হিরো' পুরস্কার দিয়েছে গ্লোবাল এ্যালায়েন্স ফর ভ্যাক্সিনেশন এন্ড ইমুনাইজেশন (GAVI)। জাতিসংঘ সদর দপ্তরে 'ইমুনাইজেশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বীকৃতি' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন GAVI এর বোর্ড সভাপতি ড. এনগোজি অকোনজো ইবিলা এবং সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সেথ ফ্রাংকলিন বার্কলে। প্রতিটি শিশুকে টিকাদান কর্মসূচির আওতায় এনে শিশুদের জীবন রক্ষাকারী জরুরি টিকাদান সম্পন্ন করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনই ছিল এই পুরস্কার প্রদানের বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে দাখিল অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

দাখিল

অষ্টম শ্রেণি

রচনা

আবু মুহম্মদ

মোঃ আবদুল হক

মোঃ তাজমুল হক

জসিম উদ্দিন আহম্মদ

সম্পাদনা

প্রফেসর আ ব ম ফারুক

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২২

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক । পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করে। সেই ধারাবাহিকতায় উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ভিশন ২০৪১ সামনে রেখে পাঠ্যপুস্তকটি সময়োপযোগী করে পরিমার্জন করা হয়েছে।

শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়টি সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন এই জীবন দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়টি মূলত ব্যাবহারিক। তাই হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং শিক্ষাকে জীবন ও বাস্তবমুখী করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষা, পুষ্টি জ্ঞান, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে। মাদকাসক্তি ও এইড্‌স-এর ভয়াবহতা সম্পর্কে জানবে, সচেতন হবে এবং এ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। একইসাথে বিভিন্ন ধরনের শরীরচর্চা ও খেলাধুলার সঠিক নিয়ম-কানুন জেনে একজন সুস্থ ও কর্মক্ষম নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রবর্তন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	শরীরচর্চা ও সুস্থজীবন	১–১১
দ্বিতীয়	স্কাউটিং, গার্ল গাইডিং ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	১২–২৭
তৃতীয়	স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পরিচিতি ও স্বাস্থ্যসেবা	২৮–৩৫
চতুর্থ	আমাদের জীবনে প্রজনন স্বাস্থ্য	৩৬–৪১
পঞ্চম	জীবনের জন্য খেলাধুলা	৪২–৭৬

প্রথম অধ্যায়

শরীরচর্চা ও সুস্থজীবন

সুস্থ জীবন সকলেরই কাম্য। সুখী ও সুন্দর জীবনের জন্য প্রয়োজন শারীরিক সুস্থতা। শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য আমরা নানা ধরনের ব্যায়াম করে থাকি। ব্যায়াম করার ফলে দেহ ও মনের উন্নয়ন সাধিত হয়। প্রতিদিন নিয়মিত ও পরিমিত ব্যায়াম করলে দেহ কাঠামো সুদৃঢ় ও সবল হয়। ব্যায়াম একাকী বা দলগতভাবে করা যায়। তবে একটানা ব্যায়াম করলে শরীরের জীবকোষগুলো ক্ষয়পূরণ করার সময় পায় না। তখন আমরা অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ি। এই ক্ষয়পূরণ এবং কর্মোদ্যম পুনরুজ্জীবিত করার জন্য পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। বিশ্রাম করলে ক্ষয়প্রাপ্ত জীবকোষগুলো পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে এবং শরীরের ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদ দূর হয়। ঘুম আমাদের শরীর ও মনকে বিশ্রাম দেয়। প্রকৃতপক্ষে ঘুম আমাদের মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেয়। ভালো ঘুম হলে শরীর ও মন সতেজ থাকে। শারীরিক সুস্থতার জন্য আমরা সরঞ্জামবিহীন ও সরঞ্জামসহ বিভিন্ন প্রকার ব্যায়াম করি। কখনো কখনো ব্যায়ামের পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগীতির মাধ্যমে শারীরিক কসরত করে থাকি। ব্রতচারী নৃত্য শারীরিক কসরতের একটি অন্যতম উদাহরণ। এই ধরনের ব্যায়াম ও শারীরিক কসরতের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক সুস্থতার সাথে সাথে আনন্দ ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ ঘটে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- শরীর গঠনে সুস্থতার জন্য ব্যায়ামের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- সঠিক নিয়মকানুন মেনে কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যায়াম গ্রহণ উপযোগী সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারব;
- প্রাত্যহিক জীবনে সহযোগিতামূলক মনোভাব বৃদ্ধি করতে পারব;
- শারীরিক সুস্থতার জন্য বিশ্রাম, ঘুম ও বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বয়ঃক্রম অনুসারে বিশ্রাম ও ঘুমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ব্রতচারী নৃত্যের মাধ্যমে শারীরিক কসরত প্রদর্শন করতে পারব;
- সঠিক পদ্ধতিতে যে ক্ষেত্রে যে ব্যায়াম উপযোগী তা অনুশীলন করতে পারব।

পাঠ – ১ : শারীরিক সুস্থতায় ব্যায়ামের প্রভাব : শারীরিক সুস্থতার প্রধান বাহন হলো ব্যায়াম। ব্যায়াম ছাড়া একজন মানুষের শারীরিক সুস্থতা আশা করা যায় না। ব্যায়াম ও খেলাধুলা শুধু দেহের বৃদ্ধি ঘটায় না, মনেরও উন্নতি সাধন করে। শরীরচর্চায় দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উন্নতি হয়। দেহ ভালো থাকলে মনও ভালো থাকে। কারণ মন ছাড়া দেহ এককভাবে চলতে পারে না, দেহ হচ্ছে মনের আধার। তাই,'সুস্থ দেহে সুন্দর মন'-এটি প্রতিষ্ঠিত প্রবাদ হিসাবে সমাজে স্বীকৃত। মনস্তত্ত্ব একটি বিজ্ঞান। এর কাজ হচ্ছে মনকে নিয়ে। কিন্তু মনের উন্নতি কীভাবে হয় তা জানা প্রয়োজন। মন কাজ করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে অর্থাৎ মস্তিষ্ক দ্বারা। প্রতিটি মানুষের দেহের মধ্যেই অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ রয়েছে। যেমন- হৃৎপিন্ড, মস্তিষ্ক, ফুসফুস, যকৃৎ, বৃক্ক, পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয়, মেরুমজ্জা প্রভৃতি। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মস্তিষ্ক। দেহের বিভিন্ন তন্ত্র নিজ নিজ ক্ষেত্র মোতাবেক কাজ করে, তবে এদের মধ্যে সমন্বয় না থাকলে দেহ অচল হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজের সমন্বয় সাধিত হয়। ব্যায়াম এ সকল অঙ্গের সুষম উন্নতি সাধন করে। তবে এই সকল ব্যায়ামের কার্যক্রম বয়স ও লিঙ্গভেদে নির্দিষ্ট সময়ে ও মাত্রায় পরিচালনা করতে হয়। শিশুর দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির সাথে সাথে শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের কর্মসূচিরও পরিবর্তন প্রয়োজন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যায়ামের কর্মসূচি সহজ থেকে ক্রমশই কঠিন হবে এবং ক্রমাগত উন্নততর হবে।

কাজ – ১ : ব্যায়ামের ফলে শরীরের কোন কোন অংশের কী কী উপকার হয় তা দলে বিভক্ত হয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

পাঠ–২ : সরঞ্জামবিহীন ব্যায়াম : সরঞ্জাম ছাড়া যে সমস্ত ব্যায়াম করা হয়, তাকে সরঞ্জামবিহীন ব্যায়াম বলে। আমরা জিমন্যাস্টিকের ভাষায় 'ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ' বা খালি হাতের ব্যায়াম বলি। নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরঞ্জামবিহীন ব্যায়াম করা হয়।

১. **স্পিড এক্সারসাইজ :** শরীরের গতি বৃদ্ধির জন্য যে ব্যায়াম করা হয় তাকে স্পিড এক্সারসাইজ বলে। প্রথমে আস্তে আস্তে দৌড়ে শরীর গরম করে নিতে হবে। পরে বিভিন্ন ধরনের ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ব্যায়ামের উপযোগী হওয়ার পর গতি বাড়ানোর জন্য অল্প দূরত্বে বারবার জোরে দৌড়াতে হবে। যেমন- ২৫ মিটার দূরে একটি দাগ দিতে হবে। শুরু থেকে ঐ দাগ পর্যন্ত পুরো গতিতে দৌড়াতে হবে। পরে জগিং করে ফিরে এসে পুনরায় জোরে দৌড়াতে হবে। এভাবে ব্যায়ামের পুরো সময় না থেমে একের পর এক ব্যায়াম করে যাওয়াকে আমরা স্পিড এক্সারসাইজ বলি। অর্থাৎ যতক্ষণ ব্যায়াম করব ততক্ষণ একনাগাড়ে করে যেতে হবে।

২. **এবডোমিনাল এক্সারসাইজ :** এবডোমিনাল এক্সারসাইজ বলতে তলপেটের ব্যায়াম করাকে বোঝায়। যখন শুধু তলপেটের মেদ কমানোর জন্য বিশেষ কিছু ব্যায়াম করা হয়, তাকে এবডোমিনাল এক্সারসাইজ বলে। যেমন- সিট আপ, হাঁটু ভেঙ্গে সিট আপ, দুই পা শূন্যে উঁচু করে রাখা ইত্যাদি।

ক. **সিট আপ :** চিৎ হয়ে শুয়ে দুই হাত মাথার নিচে দিয়ে দুই পা একত্র করে সোজা রাখতে হবে। তারপর মাথা উপর দিকে তুলে যতটা সম্ভব সামনে ঝুঁকতে হবে। এভাবে একের পর এক শরীর উঠানামা করতে হবে। এ ব্যায়াম করার সময় হাঁটু ভাঁজ করা যাবে না।

সিট আপ

খ. হাঁটু ভেঙ্গে সিট আপ : শরীরের অবস্থান সিট আপের মতো শুধু হাঁটু ভেঙে রেখে শরীরের উপরের অংশ উঠানামা করাতে হবে। এভাবে যত বেশি সিটআপ দেওয়া যাবে, তত বেশি পেটের উপকার হবে।

হাঁটু ভেঙ্গে সিট আপ

গ. দুই পা শূন্যে ধরে রাখা : চিৎ হয়ে শুয়ে দুই পা একত্রে ৮ ইঞ্চি শূন্যে তুলে রাখতে হবে। এক মিনিট পর্যন্ত রাখার চেষ্টা করবে। এভাবে বারবার করতে হবে। এ ব্যায়ামগুলোর মাধ্যমে তলপেটের মেদ কমে যায়। এছাড়াও সমবেত ব্যায়াম, চিন আপ, পুশ আপ, পিঠের উপর দিয়ে লাফানো ও দলগত রিলে সবই সরঞ্জামবিহীন ব্যায়ামের অন্তর্গত।

দুই পা শূন্যে ধরে রাখা

কাজ – ১ : দৈনন্দিন জীবনে সরঞ্জামবিহীন ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

কাজ – ২ : স্পিড এক্সারসাইজ মাঠে প্রদর্শন কর।

কাজ – ৩ : এবডোমিনাল এক্সারসাইজগুলো অনুশীলন করে দেখাও।

পাঠ–৩ : হ্যান্ড স্ট্যান্ড এবং হেড স্ট্যান্ড : এ দুটো ব্যায়ামই ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজের ভিতর পড়ে। এ ব্যায়াম করতে কোনো সরঞ্জাম লাগে না। মাটিতেই এ ব্যায়াম করা যায়।

ক. হ্যান্ড স্ট্যান্ড (হাতে ভর করে দাঁড়ানো) : বাহু সোজা রেখে দুই হাতের তালু কাঁধ বরাবর সোজা করে মেঝেতে রাখতে হবে। দুই পা সামান্য আগে ও পিছে থাকবে। পিছনের পা প্রথমে উপরে ছুড়ে দেবে ও সাথে সাথে অন্য পা উপরে তুলে একত্র করেতে হবে। কোমরসহ হাঁটু ও পায়ের পাতা সোজা মাথার উপর রাখতে চেষ্টা করবে। কোনো অবস্থাতেই কনুই ভাঁজ হবে না। প্রথমে দেয়ালে বা সাহায্যকারীর সাহায্যে এ ব্যায়াম অনুশীলন করতে হবে। ধীরে ধীরে সাহায্যকারী ছাড়াই এ ব্যায়াম অনুশীলন করার চেষ্টা করবে।

হ্যান্ড স্ট্যান্ড

খ. **হেড স্ট্যান্ড (মাথার উপর ভর করে দাঁড়ানো) :** কপাল একটু সামনে ও দুই হাতের তালু কাঁধ বরাবর একটু পিছনে মেঝেতে স্থাপন কর। দুই হাতের তালু ও কপালকে একটি ত্রিভুজের মতো কর। এবার কোমর সামনের দিকে টেনে কোমরসহ দুই পা উপরে তুলে দাও। দুই পা সোজা করে পায়ের মাথা সোজা (পয়েন্টেড) রাখ। কপাল ও দুই হাতের উপর সমান ভর থাকবে। উঠার সময় মাথা ভিতর দিক দিয়ে সম্মুখে ডিগবাজি দিয়ে উঠে পড়তে হবে।

হেড স্ট্যান্ড

> **কাজ – ১ :** হ্যান্ড স্ট্যান্ড দেওয়ার কৌশলগুলো ব্যাখ্যা কর।
>
> **কাজ – ২ :** হেড স্ট্যান্ড মাঠে প্রদর্শন কর।

পাঠ–৪ : এডুকেশনাল জিমন্যাস্টিকস : ম্যাট বা গদির উপর মুক্ত হাতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যায়াম করাকে এডুকেশনাল জিমন্যাস্টিকস বা শিক্ষামূলক জিমন্যাস্টিকস বলা হয়। শিক্ষার্থীদের বয়স ও লিঙ্গভেদে এ ধরনের ব্যায়ামের কর্মসূচি নির্ধারণ করে অনুশীলন করাতে হয়। এ ধরনের ব্যায়ামের আগে শরীরকে ভালোভাবে গরম করে নিতে হয়। ব্যায়াম শুরু করার পূর্বে মাঠ এবং সরঞ্জামগুলো ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে যাতে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা না থাকে। একজন সাহায্যকারী রাখতে হবে যেন অনুশীলন করার সময় দুর্ঘটনা না ঘটে।

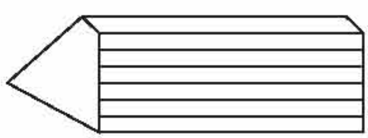

ভল্টিং বক্স

হেড স্প্রিং

১. **হেড স্প্রিং :** শিক্ষার্থীদের উচ্চতা অনুসারে ভল্টিং বক্সের উচ্চতা নির্ধারণ করতে হবে। ভল্টিংয়ের পিছনে একটি ম্যাট থাকবে। যাতে পড়ার সময় ব্যথা না পায়। একজন সাহায্যকারী থাকবে। সে ভল্টিং বক্সের মাথায় বসে তাকে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীকে ১৫-২০ ফুট দূর থেকে দৌড়ে আসতে হবে। দুই হাত বক্সের উপর রেখে মাথা বক্সের সাথে লাগিয়ে দুই হাতের উপর ভর দিয়ে বা ধাক্কা দিয়ে শরীর সুইং

করে দুই পা একত্র করে ল্যান্ডিং করতে হবে। যেহেতু মাথা লাগিয়ে এ ব্যায়ামটি করতে হয়, সেজন্য এর নাম হেড স্প্রিং। যখন হাত দ্বারা পুশ দিবে, তখন সাহায্যকারী প্রয়োজন হলে সাহায্য করবে। কারণ ঐ সময় হাত পিছলে মাথা নিচে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এভাবে একের পর এক সারিবদ্ধভাবে দৌড়ে এসে এ ব্যায়ামটি অনুশীলন করতে হবে।

নেক স্প্রিং

২. **নেক স্প্রিং :** নেক স্প্রিংও জিমন্যাস্টিক ম্যাট বা নরম মাটিতে করতে হয়। সবকিছু হেড স্প্রিংয়ের মতো। শুধু মাথার পরিবর্তে ঘাড় লাগাতে হবে। কাছ থেকে আস্তে দৌড়ে এসে ঘাড় ম্যাটের উপরে রেখে দুই হাতের উপর ভর দিয়ে ল্যান্ডিং করতে হবে।

৩. **হ্যান্ড স্প্রিং :** হ্যান্ড স্প্রিং ম্যাটে বা নরম মাটিতে করতে হবে। হ্যান্ড স্প্রিং করার সময় ৪-৫ ফুট দূর থেকে দুই-তিন স্টেপ নিয়ে দুই হাত মাটিতে রাখার সাথে সাথে মাটিতে পুশ দিয়ে ঘুরে উঠে সোজা হতে হবে। যেহেতু হাতের উপর ভর বা পুশ দিয়ে উঠতে হয়, সেজন্য একে হ্যান্ড স্প্রিং বলে।

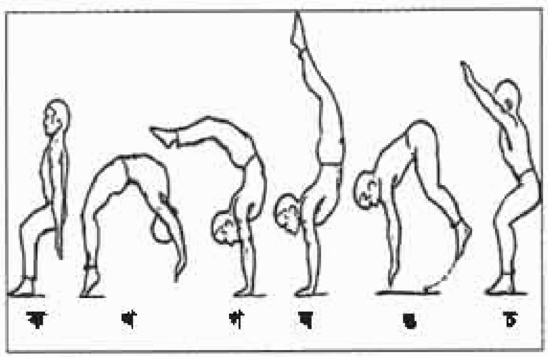

হ্যান্ড স্প্রিং

কাজ – ১ : হেড স্প্রিং দেওয়ার কৌশলগুলো করে দেখাও।
কাজ – ২ : নেক স্প্রিং অনুশীলন করে দেখাও।
কাজ – ৩ : হ্যান্ড স্প্রিং এর কৌশলগুলো প্রদর্শন কর।

পাঠ–৫ : সরঞ্জামসহ ব্যায়াম : যেকোনো উদ্দেশ্য সামনে রেখে সরঞ্জাম নিয়ে ব্যায়াম করাকে সরঞ্জামসহ ব্যায়াম বলে। যেমন- ক্লাইম্বিং রোপ, রোমান রিং, ট্রিপজবি, বল পাসিং, বল নিয়ন্ত্রণ, সাইক্লিং ইত্যাদি। সপ্তম শ্রেণিতে ইতিপূর্বে রোমান রিং ও ট্রিপজবি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১. **ক্লাইম্বিং রোপ :** দড়ি বা রশি বেয়ে উপরে উঠাই হলো ক্লাইম্বিং রোপ। এই ব্যায়াম করার সময় যে রশি ব্যবহার করা হয় তা বেশি মোটা বা খুব চিকন হবে না। বেশি মোটা হলে ধরতে অসুবিধে হয় আবার চিকন হলে হাতে ব্যথা পাওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। যেকোনো গাছের ডালে রশি বেঁধে ঝুলা বা বেয়ে উপরে উঠাই হলো ক্লাইম্বিং। প্রথমে উঠতে অসুবিধা হলে দড়ির মাঝে মাঝে গিঁট দিতে হবে, যাতে গিঁট ধরে ধরে উপরে উঠা যায়। এ ধরনের ব্যায়ামে হাতের শক্তি বাড়ে।

২. **বল পাসিং:** খেলোয়াড়ের সংখ্যা অনুসারে কয়েকটি সারিতে দাঁড় করাতে হবে। প্রত্যেক সারিতে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকবে। সকল খেলোয়াড় পা ফাঁক করে দাঁড়াবে। সারির সম্মুখের খেলোয়াড়ের নিকট বল থাকবে। সংকেতের সাথে সাথে দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে বল পিছনে দিবে। এভাবে বলটি সারির পিছনের খেলোয়াড়ের নিকট যাবে। বল দেওয়া শেষ হলে বল মাথার উপর দিয়ে পাস দিয়ে সামনে আসবে। যে সারির বল পাস দেওয়া আগে শেষ হবে তারা বিজয়ী হবে।

কাজ – ১ : ক্লাইম্বিং রোপের কৌশলগুলো করে দেখাও।
কাজ – ২ : গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বল পাসিং এর কৌশলগুলো প্রদর্শন কর।

পাঠ–৬ : বিশ্রাম, ঘুম ও বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা : শরীর সুস্থ না থাকলে মন ভালো থাকে না। ফলে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করা যায় না। কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন নিজেকে সুস্থ রাখা। শুধু ব্যায়াম করলেই শরীর সুস্থ রাখা যায় না। আমাদের দেহে খাদ্য ও পানির যেমন প্রয়োজন তেমনি বিশ্রাম ও ঘুমেরও প্রয়োজন রয়েছে। শরীর সুস্থ রাখার জন্য ব্যায়ামের পর শরীর ও মনের বিশ্রাম এবং ঘুমের প্রয়োজন। চলাফেরা, কাজকর্ম ও ব্যায়ামের পর শরীর পরিশ্রান্ত হয়, শরীরের জীবকোষগুলো ক্ষয় হতে থাকে। তখন আমরা অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ি। শরীরের জীবকোষগুলোর ক্ষয়পুরণ ও পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন। বিশ্রামে শরীরের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হয়। বিশ্রাম ও ঘুমের পরিবেশ শান্ত ও নির্জন হলে ভালো ঘুম হবে এবং দেহ ও মনের বিকাশ অব্যাহত থাকবে। ঘুমের সময় দেহের সমস্ত অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা স্থির হয়ে পূর্ণ বিশ্রামে থাকে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ও হজমশক্তির কাজ সুশৃঙ্খলভাবে চলতে থাকে। বিশ্রাম ও ঘুমের পাশাপাশি শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য বিনোদনও একটি মাধ্যম।

যখন কোনো ব্যক্তি স্বতস্ফূর্তভাবে আনন্দ সহকারে তার সময় কাটায় তাকে চিত্তবিনোদন বলে। খেলাধুলা চিত্তবিনোদনের একটি মাধ্যম। খেলাধুলার মাধ্যমে চিত্তবিনোদন ছাড়াও সমাজে আরও বহু ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা আছে। যেমন– ভ্রমনের মাধ্যমে বিনোদন, সিনেমা ও টিভির অনুষ্ঠান দেখে বিনোদন, নাটক উপভোগের মাধ্যমে বিনোদন, বনভোজনের মাধ্যমে বিনোদন, বই পড়ার মাধ্যমে বিনোদন, গল্প করার মাধ্যমে বিনোদন ইত্যাদি। সমাজে বসবাসরত মানুষের আগ্রহ ও চিন্তাধারা ভিন্ন হওয়ায় বিনোদনের ধারাও ভিন্ন। যে বিনোদনের মাধ্যমে কিছু শেখা যায়, তাকে শিক্ষামূলক বিনোদন বলে। যেমন :

১. **শিক্ষামূলক গ্রন্থাবলি পাঠ :** বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ পাঠের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান লাভ করতে পারে। কে কী ধরনের গ্রন্থাবলি পাঠ করবে তা ব্যক্তিগত আগ্রহের উপর নির্ভর করে। কেউ গল্পের বই পড়ে, কেউ ধর্মীয় বই পড়ে, কেউ উপন্যাস বা ক্রীড়া বিষয়ক ম্যাগাজিন পড়ে জ্ঞান লাভ করে থাকে।

২. **টিভি ও কম্পিউটারের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে :** বর্তমানে কম্পিউটার ও টেলিভিশনে বহু ধরনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখানো হয়। তা দেখে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন ও চিত্তবিনোদন করে থাকে। টিভিতে খেলাধুলা, ম্যাগাজিন শো, বিতর্ক অনুষ্ঠান দেখে এবং কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের গেম খেলে শিক্ষার্থীরা আনন্দ লাভ করে।

৩. **আবৃত্তি ও সংগীত:** অনেক পরিবারের মধ্যে আবৃত্তি ও সংগীতচর্চার মাধ্যমে অবসর সময় কাটানোর প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি ও সংগীতে অংশগ্রহণ করেও শিক্ষার্থীরা প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায় ও চিত্তবিনোদন করে থাকে।

৪. **ভ্রমণ :** শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের সময় বা পরীক্ষা শেষে অনেকে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যায় বা বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখতে ভ্রমণকে বেছে নেয়। ভ্রমণের জন্য কেউ কেউ দেশে বা বিদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে যায়। কখনো কখনো পরিবারের সবাই মিলে অথবা ক্লাসের সহপাঠি ও শিক্ষকবৃন্দ মিলে বনভোজনের জন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যখ্যাত স্থান, সমুদ্রতীর, ইতিহাসখ্যাত দর্শনীয় ২০২১

স্থানগুলো ভ্রমণ করে শিক্ষার্থীরা চিত্তবিনোদনের সাথে সাথে জ্ঞান অর্জন করে থাকে।

> **কাজ – ১ :** ঘুম ও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

পাঠ – ৭ : বয়স ও শারীরিক গঠন অনুসারে বিশ্রাম ও ঘুমের চাহিদা : বয়স ও শারীরিক গঠনের উপর বিশ্রাম ও ঘুমের চাহিদার তারতম্য হয়ে থাকে। যারা শিশু, তাদের বিশ্রাম ও ঘুমের চাহিদা একরকম। যারা কিশোর, তাদের বিশ্রাম ও ঘুমের চাহিদা ভিন্নতর। শিশু, যুবক ও বয়স্কদের বিশ্রাম ও ঘুমের চাহিদার পার্থক্য রয়েছে। শৈশবকাল হচ্ছে শিশুর বেড়ে উঠার সময়। এ সময় শিশু যেমন শারীরিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তেমনি মানসিক বিকাশও ঘটে, যা তাকে খেলাধুলা ও পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী করে তোলে। শিশুকে খেলাধুলা করার সুযোগ করে দিতে হবে। খেলাধুলা করার পর কিছু সময় বিশ্রাম নিলে শারীরিক ক্লান্তি দূর হয়। যে সমস্ত শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি বেশি, তারা অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এদের ঘুমের প্রয়োজন হয় বেশি। সাধারণত ৯-১০ ঘণ্টা ঘুমাতে পারলে একটি শিশুর সারাদিনের ক্লান্তি দূর হয়। বয়স অনুসারে নিচে ঘুমানোর একটি চার্ট দেওয়া হলো –

১. ৫ থেকে ৭ বছর বয়স পর্যন্ত ঘুমের প্রয়োজন ১০-১১ ঘণ্টা।
২. ৮ থেকে ১১ বছর বয়স পর্যন্ত ঘুমের প্রয়োজন ৯-১০ ঘণ্টা।
৩. ১২ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ঘুমের প্রয়োজন ৮-৯ ঘণ্টা।
৪. ১৫ বছরের উর্ধ্বে বয়স পর্যন্ত ঘুমের প্রয়োজন ৬-৮ ঘণ্টা।

উপরোক্ত চার্ট অনুযায়ী সময়মতো ঘুমাতে যাওয়া এবং ঘুম থেকে উঠার পরামর্শ দিতে হবে।

> **কাজ – ১ :** বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের ঘুমের চাহিদা বিশ্লেষণ কর।
>
> **কাজ – ২ :** বয়সভেদে ঘুমের একটি চার্ট প্রস্তুত করে শ্রেণিকক্ষে ঝুলিয়ে রাখ।

পাঠ– ৮ : ব্রতচারী নাচ : গানের তালে তালে নাচের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে সকলেই পছন্দ করে। আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যে লালিত আঞ্চলিক নাচের মাধ্যমে সহজেই আনন্দের সাথে দৈহিক ব্যায়াম ও অঙ্গ-ভঙ্গিমা প্রদর্শন করা যায়। বাংলাদেশের জনপ্রিয় আঞ্চলিক নাচগুলোর মধ্যে লড়ি নাচ অন্যতম। শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রীরা সহজেই এই নাচগুলো অনুশীলন করতে পারে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন শারীরিক কসরত ও মানসিক আনন্দ পাওয়া যায়।

লড়ি নাচ :

স্থান- খেলার মাঠ, সরঞ্জাম-একটি বাঁশের লড়ি ও ঢোল।

তাল- ঝা, ঝা ঝা, ঝা তা তা।

লড়ি নাচে কয়েকটি স্তর রয়েছে

ক. হুঁশিয়ার পজিশন খ. পাঁয়তারা গ. নৌকাবাইচ ঘ. সখা ঙ. মানুষ পোতা চ. বিজয়।

১. **হুঁশিয়ার পজিশন :** খেলোয়াড়রা বাম হাতে লড়ি নিয়ে সোজা অবস্থায় দাঁড়াবে। লড়ির মাথা ৭-৮ ইঞ্চি বাদ রেখে ধরতে হবে। লড়ির শেষ মাথা মাটির দিকে থাকবে। অর্থাৎ পরবর্তী কার্যক্রম করার জন্য প্রস্তুত থাকা।

২. **পাঁয়তারা :** জোড় সংখ্যার খেলোয়াড়রা দু ফাইলে দাঁড়াবে বা লাইনে দাঁড়াবে। বাজনার তালে তালে ফাইলগুলো ডাবল মার্চ করে আরম্ভ স্থানে ফিরে আসবে।

৩. **নৌকাবাইচ :** ১ম সংকেতে বাজনা বাজতে শুরু করবে। ২য় সংকেতে খেলোয়াড়রা ডান হাত দ্বারা লড়ির মাথা ধরে একটানে ডান দিক দিয়ে ঘুরিয়ে কাঠি পিঠের উপর রাখবে। বাম হাত দিয়ে কাঠির নিচ প্রান্ত ধরে কাঠির সাহায্যে পিঠে চাপ দিবে। ৩য় সংকেতে ছোট লাফ সহকারে বাম পা সামনে ও ডান পা পিছনে যাবে। উভয় হাঁটু সামান্য ভাঁজ করে সামনে ঝুঁকে থাকবে। ৪র্থ সংকেতে নৌকার মতো দুলে দুলে পা দুটি সামনে ও পিছনে নিয়ে অগ্রসর হতে থাকবে। ৫ম সংকেতে নির্দিষ্ট সীমারেখায় পৌঁছামাত্র পূর্বের জায়গায় ফিরে আসবে। ৬ষ্ঠ সংকেতে আরম্ভ রেখায় এসে নাচতে থাকবে। ৭ম সংকেতে নাচ বন্ধ হবে। ৮ম সংকেতে লড়ি পিঠ থেকে টেনে এনে হুঁশিয়ার পজিশনে আসবে।

৪. **সখা :** ১ম সংকেতে খেলোযাড়রা ডান হাত দিয়ে বাম দিকের লড়ির এক প্রান্ত ধরে একটানে বের করে জানুর উপর দুই হাত দিয়ে ধরে দাঁড়াবে। ২য় সংকেতে লড়িসহ বাম হাত সোজা করে উপরে উঠাবে এবং সেদিকে তাকাবে। ডান পা বাম পায়ের উপর আড়াআড়ি রাখবে। ৩য় সংকেতে সব দল এভাবে নাচতে নাচতে সামনের দিকে অগ্রসর হবে। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছালে সব দল ঘুরে পূর্বের জায়গায় ফিরে এসে নাচতে থাকবে। ৪র্থ সংকেতে নাচ থামবে। ৫ম সংকেতে হুঁশিয়ার পজিশনে চলে যাবে।

৫. **মানুষ পোতা :** ১ম সংকেতে ডান হাত দিয়ে লড়ির মাথা টেনে এনে মাথা কলমের মতো করে ধরে পিঠের সাথে রাখতে হবে। ২য় সংকেতে ডান পা বাম দিকে ঘুরে শরীর বাঁকা করে সামনে ঝুঁকতে হবে। হাত ও পায়ের বিট একসাথে হবে। এভাবে নাচতে নাচতে একটি বৃত্ত করতে হবে। যতটি দল থাকবে ততটি বৃত্ত হবে। ৩য় সংকেতে নাচ থামবে। ৪র্থ সংকেতে লড়ি ঘুরিয়ে শরীরের পিছনে অর্থাৎ পিঠের উপর রাখতে হবে। ডান হাত কান বরাবর লড়িসহ উঁচু থাকবে।

৬. **বিজয় :** ১ম সংকেতে পায়ের তালের সাথে মাথা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকবে। এভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নাচতে থাকবে। ২য় সংকেতে বাম সাইডে ঘুরে নাচতে থাকবে। ৩য় সংকেতে নাচ থেমে যাবে। ৪র্থ সংকেতে সবাই এক লাফে ডান দিক ঘুরে দাঁড়াবে। ৫ম সংকেতে লড়ি হুঁশিয়ার পজিশনের অবস্থায় নিয়ে আসবে।

লড়ি নাচের গান

চল্ কোদাল চালাই
ভুলে মনের বালাই
ঝেড়ে অলস মেজাজ
হবে শরীর ঝালাই।
যত ব্যাধির বালাই
বলবে পালাই পালাই
পেটে খিদের জ্বালায়
খাব ক্ষীর আর মালাই।

এ ছাড়া আরও বহু লোকগীতি রয়েছে, যা দ্বারা আমরা শারীরিক কসরতের মাধ্যমে আনন্দলাভ করতে পারি। যেমন– জারি, সারি, বাউল ইত্যাদি। নিচে কয়েকটি লোকগীতির নমুনা দেওয়া হলো–

১. জারি গান

আরে ভালো ভালো ভালোরে ভাই
    আরে ও ও আহা বেশ ভাই
আমরা আল্লার নামটি লইয়ারে ভাই
    আমরা নাইচা নাইচা সবাই যাই
আরে শোন ক্যান শোন ক্যান মোমিন ভাই
    আমরা বেয়াদপির মাপটি চাই ॥

২. সারি গান

ও কাইয়ে ধান খাইলরে
    খেদানের মানুষ নাই
খাওয়ার বেলায় আছে মানুষ
    কামের বেলায় নাই
কামের বেলায় নাই
    কাইয়ে ধান খাইলরে।
ওরে হাত পাও থাকিতে তোরা
    অবশ হইয়া রইলি,
কাইয়ে না খেদায়ে তোরা
    খাইবার বসিলি
কাইয়ে ধান খাইল রে।
    ওরে ও পাড়াতে পাটা নাই পুতা নাই
মরিচ বাটে গালে,
    তারা খাইল তাড়াতাড়ি
আমরা মরি ঝালে
    কাইয়ে ধান খাইল রে।

দলীয় কাজ – ১ : কয়েকজন শিক্ষার্থী লড়ি নৃত্য মাঠে প্রদর্শন করে দেখাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন ব্যায়াম করতে হলে সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়?

ক. হেড স্ট্যান্ড
খ. হ্যান্ড স্ট্যান্ড
গ. হেড স্প্রিং
ঘ. হ্যান্ড স্প্রিং

২. কোন ব্যায়াম করার সময় একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন?

ক. হেড স্প্রিং
খ. হ্যান্ড স্প্রিং
গ. হেড স্ট্যান্ড
ঘ. হ্যান্ড স্ট্যান্ড

৩. সবচেয়ে বেশি ঘুমের প্রয়োজন হয় কাদের?

ক. শিশু
খ. কিশোর
গ. যুবক
ঘ. বয়স্ক

৪. এবডোমিনাল এক্সারসাইজে শরীরের কোন অংশের মেদ কমে?

ক. বাহুর
খ. উরুর
গ. নিতম্বের
ঘ. তলপেটের

৫. প্রাত্যহিক ব্যায়ামকে কার্যকর করতে প্রধান ভূমিকা পালন করে নিম্নের কোনটি?

ক. বিশ্রাম ও ঘুম
খ. খেলাধুলা
গ. চিত্তবিনোদন
ঘ. নির্মল পরিবেশ

৬. শারীরিক সুস্থতার প্রধান বাহন কোনটি–

ক. প্রাত্যহিক ব্যায়াম
খ. পরিমিত খাবার
গ. আর্থিক সচ্ছলতা
ঘ. নিয়মিত চিকিৎসা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মেধা অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। ঘুম ঘুম চোখে তার মা সকাল সাতটায় তাকে মাদরাসা নিয়ে যায়। মাদরাসা থেকে ফিরে মাদরাসার পড়া তৈরি করা, ছোট ভাইবোনদের আরবি পড়ানো আর বাড়ির কাজ করতে করতে সারাটা দিন লেগে যায়। ঘুমাতে ঘুমাতে রাত ১১টা বেজে যায়। এভাবে কিছুদিন পর দেখা গেল মেধা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কারো সাথে মেশার সুযোগ না পাওয়ায় পড়ালেখা তার কাছে এখন বিরক্তিকর মনে হয়।

৭. মেধার কাছে লেখাপড়া বিরক্তিকর মনে হওয়ার কারণ –

i. পিতা–মাতার অসচেতনতা
ii. বয়স অনুপাতে বেশি পরিশ্রম করা
iii. পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু কঠিন

২০২১

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i. ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৮. মেধার শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে কোনটি?

ক. পুষ্টিকর খাবার
খ. নিয়মিত শরীরচর্চা
গ. প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও ঘুম
ঘ. সহপাঠিদের সাথে খেলাধুলা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

প্রধান শিক্ষক জামাল সাহেবের মেদ বেড়ে যাওয়ায় শারীরিক শিক্ষার শিক্ষকের পরামর্শে এক ধরনের ব্যায়াম করেন। এতে তার মেদ উল্লেখযোগ্য পরিমানে কমে যায়। এরপর থেকে তিনি মাদরাসায় অধিক সময় থেকে শিক্ষকদের ক্লাসরুম মনিটরিংসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ডে আগের চাইতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে লাগলেন।

৯. জামাল সাহেবের ব্যায়ামটি কোন ধরনের?

ক. স্পিড এক্সারসাইজ
খ. এবডোমিনাল এক্সারসাইজ
গ. এডুকেশনাল জিমন্যাস্টিক্স
ঘ. সরঞ্জামসহ ব্যায়াম

১০. উক্ত ব্যায়ামের ফলে জামাল সাহেবের কী উপকার হয়?

ক. হাতের শক্তি বাড়ে
খ. পায়ের শক্তি বাড়ে
গ. দৈহিক কর্মক্ষমতা বাড়ে
ঘ. পেটের পেশীর শক্তি বাড়ে

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পরিমিত বিশ্রাম ও ঘুম সুস্থ থাকতে সহায়তা করে–ব্যাখ্যা কর।

২. 'সুস্থ দেহে সুন্দর মন'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

৩. এবডোমিনাল এক্সারসাইজ মূলত শরীরের গতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে–মতামত দাও।

৪. কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ সুস্থ দেহ ও মনের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে–ব্যাখ্যা কর।

৫. যত ব্যাধির বালাই
বলবে পালাই পালাই– কীভাবে? ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্কাউটিং, গার্ল গাইডিং ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং বিশ্বব্যাপী একটি অরাজনৈতিক সমাজসেবামূলক যুব আন্দোলন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই স্কাউটিং ও গার্ল গাইডের কার্যক্রম প্রচলিত। বৃটিশ সেনাবাহিনীর তৎকালীন লেফটেন্যান্ট জেনারেল রবার্ট স্টিফেন্সন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ১৯০৭ সালে স্কাউটিং এবং ১৯১০ সালে গার্ল গাইড প্রবর্তন করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে বয়েজ স্কাউট গঠিত হয়। বর্তমানে ছেলে মেয়ে উভয়ই অংশগ্রহণ করে সেজন্য এর নাম হয়েছে বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি। এটি ১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক স্কাউট সমিতির অনুমোদন পায়। রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন একটি আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী আন্দোলন। যার মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল কিছুর ঊর্ধ্বে থেকে মানুষের জীবন ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। পূর্বের শ্রেণিতে স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং কী? এর ইতিহাস, মূলমন্ত্র, প্রতিজ্ঞা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এর কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মেম্বারশীপ ব্যাজ

ট্রেফয়েল ব্যাজ

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- হাইকিং ও প্রজেক্টের নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- নেতৃত্বদান ও মানবসেবায় স্কাউটিং, গার্ল গাইডিং ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- স্কাউটিং, গার্ল গাইডিং ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মাধ্যমে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মনোভাব অর্জন করতে পারব;
- প্রাথমিক প্রতিবিধান / চিকিৎসার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাটো দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারব।

পাঠ–১ : হাইকিং ও প্রজেক্ট তৈরি : হাইকিং শব্দের অর্থ উদ্দেশ্যমূলক ভ্রমণ। যেকোনো পথ নির্দেশিকা অনুসরণ করে নির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে স্কাউট ও গার্ল গাইড পায়ে হেঁটে ভ্রমণ এবং ভ্রমণকালে পথিমধ্যে আশপাশের পরিবেশ ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করবে। সাধারণত একাকী, দুইজন অথবা একটি উপদল হাইকিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে। হাইকিংয়ে এক বা একাধিক রাত বাইরে কাটাতে হয়। হাইকিং এর মাঝে মাঝে প্রতিবন্ধকতা বা স্টেশন করে স্কাউট ও গার্ল গাইড প্রশিক্ষণ অনুশীলন করা যায়। হাইকিংয়ের মাধ্যমে বিশেষ করে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, মানচিত্র অংকন, অনুসরণ চিহ্ন, কম্পাস স্থাপন, ফিল্ডবুক তৈরি, কোড এন্ড সাইফার, সামাজিক জরিপ, রান্না ও অন্যান্য বিষয়সমুহ শিখানো বা অনুশীলন করা সম্ভব। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে তাঁবু খাটানো, রান্না করা, খাওয়া, সামাজিক জরিপ, তাঁবু জলসা (Campfire), নিদ্রা যাওয়া এবং হাইকিং শেষ করে আসার সময় জমির মালিক বা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে ক্যাম্পে পৌঁছে রিপোর্ট করতে হয়। হাইকিং পরিশ্রমের এবং কষ্টের কাজ হলেও এটি যেমন আনন্দের, তেমনি শরীরের জন্যও উপকারী। এটি একটি উদ্দীপনাপূর্ণ চিত্তবিনোদন ও শিক্ষামূলক কর্মসূচি। এর মাধ্যমে স্কাউট ও গার্ল গাইডেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দ্বারা তাদের মনকে উদার করে তোলে।

পাঠ–২ : কম্পাস : কম্পাস একটি দিক নির্ণয়কারী যন্ত্র। কম্পাসের মাঝে একটি কাঁটা থাকে। যন্ত্রটি যেদিকে ঘুরানো হোক না কেন কাঁটার মুখ উত্তর দিকে চলে আসবে। কোনো অচেনা যায়গায় গেলে বা রাতের অন্ধকারে দিক হারিয়ে ফেললে কম্পাসটি সঠিক দিকের নির্দেশনা দেয়।

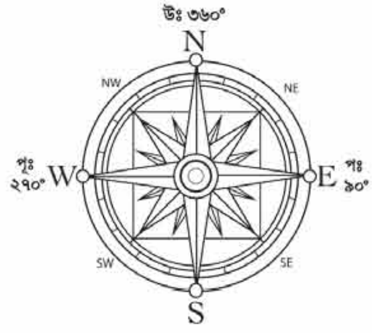

কম্পাসের ছবি

মানচিত্র : হাইকিং এর নিদির্ষ্ট স্থানে পৌঁছাতে রাস্তার উভয়দিকে যে সমস্ত জিনিষ দেখা ও অতিক্রম করা হয় তার একটি চিত্র তুলে ধরাই হল হাইকিং এর মানচিত্র। রাস্তায় বসে ম্যাপ আকার দরকার হয়না। সংক্ষেপে খুটিনাটির বিবরণ যেমন– মাদরাসা, মসজিদ, হাটবাজার, বনজঙ্গল, পুকুর, পাকা রাস্তা, উঁচু জায়গা ইত্যাদির সংখ্যা ও দূরত্ব স্কাউট/গাইডদের ফিল্ডবুকে লিখে রাখবে। পরে ক্যাম্পে ফিরে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে মানচিত্র অংকন করবে।

পেট্রোল সিস্টেম এবং কর্মসূচি প্রণয়ন

পেট্রোল সিস্টেম ঃ পেট্রোল সিস্টেম লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল প্রথমে ভারতে প্রচলন করেন। প্রথমে তিনি অল্প বয়স্ক সৈনিকদের মাঝে পেট্রোল সিস্টেমে স্কাউটিং এর শিক্ষাদান করেন। এরপর এই পদ্ধতি পৃথিবীর সব স্কাউট ও গাইড দলের মধ্যে প্রচলন করা হয়। ছোট ছোট উপদলে ভাগ হয়ে কাজ করাকে পেট্রোল সিস্টেম বলে।

পেট্রোল সিস্টেমের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মেয়েদেরকে নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিটি স্কাউট বা গাইড কোম্পানি পর্যায়ে তার মতামত পৌঁছাতে পারে এবং তারা তাদের নিজ পেট্রোলে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে।

কর্মসূচি প্রণয়ন : হাইকিংয়ের মান সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। উপদল (পেট্রোলের) মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে হাইকিংয়ের আগের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কর্মসূচি প্রণয়ন করা উচিত। উপদল (পেট্রোলের) নেতাকে পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে গ্রুপ স্কাউট বা গাইড কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে হাইকিংয়ের কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হয়। সংশ্লিষ্ট থানার স্কাউট বা গাইড কমিশনারের অনুমতি অবশ্যই থাকতে হবে।

১. চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়ার পূর্বে সকল কর্মসূচিকে একবার পর্যালোচনা বা যাচাই করে সংযোজন বা বিয়োজন করা আবশ্যক।

২. স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইউনিট লিডারকে দূরত্ব, সুগম পথ, গোসল ও খাওয়ার পানির সুব্যবস্থা, জায়গার অবস্থা, বাজারের নৈকট্য, ডাক্তারখানা, কর্মসূচি বাস্তবায়নের উপযোগী প্রাকৃতিক পরিবেশ, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বিকল্প আশ্রয়স্থল ইত্যাদি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

৩. ইউনিট লিডারকে ট্রেনিং সিডিউল তৈরি করে প্রশিক্ষণের সরঞ্জাম যোগাড় করতে হবে।

৪. নির্বাচিত স্থানের মালিকের বা প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি এবং স্কাউট বা গাইডদের অভিভাবকের সম্মতি নিতে হবে।

৫. স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দুর্বলদের বাদ দিতে হবে।

৬. কখন শুরু হবে, কত দিন থাকতে হবে এবং কখন শেষ হবে পূর্বেই তা নির্ধারণ করতে হবে।

৭. কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য একটি বাজেট তৈরি করতে হবে। বাজেট তৈরিতে অবশ্যই মিতব্যয়িতার নীতি অবলম্বন করতে হবে।

৮. প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষক, কোয়াটার মাস্টার, প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী ও স্যানিটারি পর্যবেক্ষণকারী নিয়োগ করতে হবে।

৯. শুকনো জ্বালানি কাঠ ও সুষম খাদ্য বাজেট অনুপাতে কিনতে হবে।

১০. পূর্বেই স্যানিটেশন ব্যবস্থা করে রাখতে হবে।

১১. পথ সংকেত, কম্পাস রিডিং, মানচিত্র অংকন ও পঠন, তাঁবু খাটানোর কৌশল, রান্না করা, সাঁতার, পাইওনিয়ারিং, প্রাথমিক প্রতিবিধান, উদ্ধারকাজ, রাস্তায় চলার নিয়ম ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা দিতে হবে।

১২. সোজা হয়ে স্কাউট কদমে (২০ কদম হাঁটা ও ২০ কদম দৌড়ানো) হাঁটতে হবে। প্রতি দুই মাইলে ৫ মিনিট বিশ্রাম করতে হবে।

তাঁবুতে বসবাসের সময় নিজেদের মালপত্র গুছিয়ে রাখার জন্য গ্যাজেট তৈরি করতে হয়। বাঁশ, গাছের ডাল ও দড়ি দিয়ে এসব গ্যাজেট তৈরি করা হয়। দড়ির সাহায্যে বিভিন্ন গেরো বাঁধতে পারা এবং তা সঠিক ভাবে প্রদর্শন করতে পারার নাম পাইওনিয়ারিং। বর্তমান যুগ উন্নত প্রযুক্তির যুগ। এই উন্নত প্রযুক্তির যুগে প্রজেক্টরের মাধ্যমে হাইকিং ও পাইওনিয়ারিং প্রজেক্ট প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায়। এতে হাইকিং ও পাইওনিয়ারিং সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা স্পষ্ট ধারণা লাভ করবে।

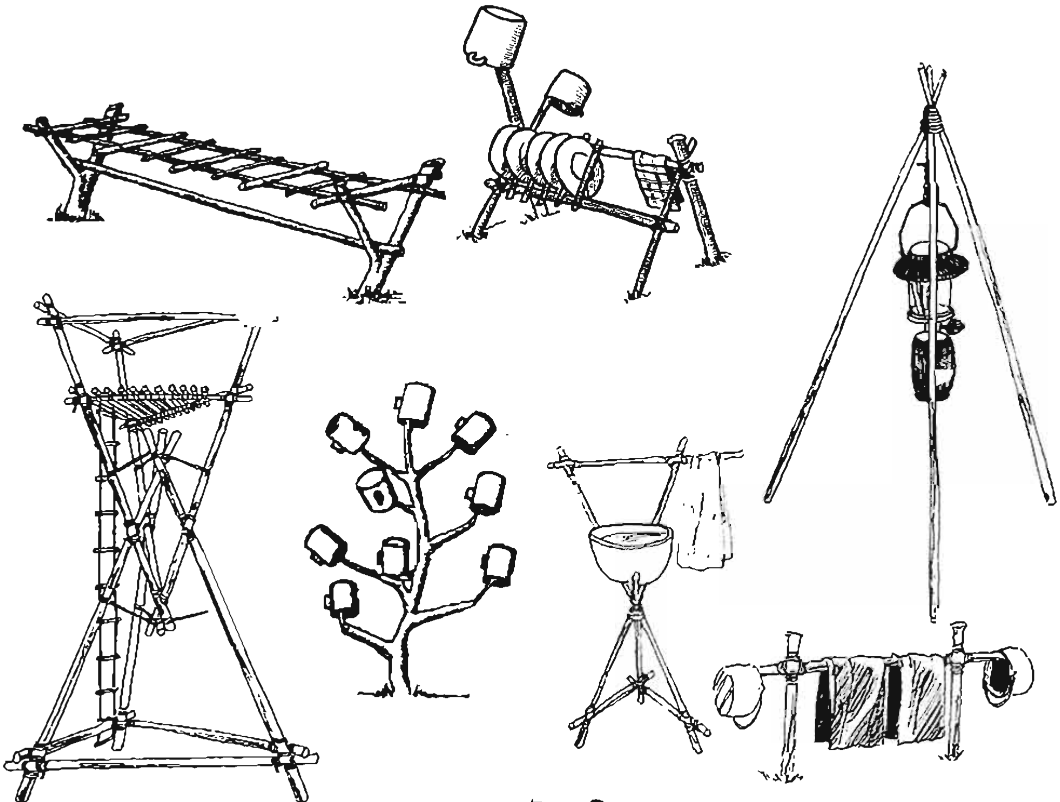

গ্যাজেটের ছবি

কাজ – ১ : হাইকিং ও প্রজেক্ট তৈরির কর্মসূচি লেখ।

কাজ – ২ : শ্রেণিকক্ষে একজন গাইড বা স্কাউট দড়ির সঠিক গেরো ব্যবহার করে বাঁশ ও কাঠের টুকরা দিয়ে গ্যাজেট তৈরি করে দেখাও।

পাঠ–৩ : নেতৃত্বদান ও মানবসেবায় স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং : মানুষ পৃথিবীর যেখানেই বাস করুক না কেন দলবদ্ধভাবে বাস করার চেষ্টা করে। এভাবেই গড়ে উঠে সমাজ। সমাজে বাস করাই হলো মানুষের বৈশিষ্ট্য। সে যে সমাজে বাস করে, সেই সমাজের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করে। সমাজ পাড়াভিত্তিক হতে পারে আবার গ্রামভিত্তিক হতে পারে। যে সমাজেই বসবাস করুক না কেন, সমাজের পরিবেশ সুন্দর করা সকলের দায়িত্ব। যেমন- একটি পুকুর পরিষ্কার আছে অথচ আরেকটি পুকুর কচুরিপানায় ভরা। অপরিষ্কার পুকুরটি কচুরিপানা পরিষ্কার না করায় যে মশা হয়, সে মশা সকলের জন্য ক্ষতিকর। যদি উদ্যোগ নিয়ে সকলের সহযোগিতায় ঐ পুকুরের কচুরিপানা পরিষ্কার করা যায়, তবে সেই পুকুরের পানি ভালো থাকবে, ভালোভাবে মাছ চাষ করা যাবে আবার মশার জন্ম বন্ধ হবে। একইভাবে বাজারে যাবার রাস্তাটি বর্ষা বা কোনো কারণে হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে। সকলের সহযোগিতায় রাস্তাটি মেরামত করে চলাচলের উপযোগী করতে হবে। এভাবে সমাজে ছোট ছোট উন্নয়নমুলক কাজের মাধ্যমে নিজকে বড় কাজ করার জন্য তৈরি করা যায়। সমাজের কল্যাণের জন্য এ ধরনের অনেক কাজ করার আছে। এ ধরনের কাজকে সেবামূলক কাজ বলে।

স্কাউটিং এবং গার্ল গাইডের মূলমন্ত্রই হচ্ছে ‘সেবা’। এই সেবা হতে পারে আত্মসেবা, সমাজের সেবা ও মানবসেবা। আত্মসেবার অর্থ একজন আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলা। শ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও চেষ্টায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই আত্মসেবার মূল লক্ষ্য। নিজে আত্মনির্ভরশীল না হতে পারলে অপরের সেবা বা কোনো বৃহত্তর কাজই করা সম্ভব নয়। অতএব নিজকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে একজন স্কাউট ও গার্ল গাইড সমাজের সাধারণ মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করতে পারে। প্রত্যেক স্কাউট ও গার্ল গাইড সমাজের সদস্য হিসাবে পরিবার ও সমাজের কথা চিন্তা করে। তাই নিজের পরিবারের মা, বাবা, ভাই, বোনের প্রতি সব সময় তার করণীয় দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে। তাছাড়া সমাজের বৃদ্ধ, পঙ্গু, প্রতিবন্ধী, নারী, শিশু, অসুস্থ ও অসহায় মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে থাকে। সমাজে সেবাধর্মী যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে, তার মধ্যে স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধায়, সৎ ও সত্যবাদিতায়, জীবের প্রতি দয়ায়, চিন্তা-চেতনা ও কর্তব্যপরায়ণতায় স্কাউট ও গার্ল গাইড আদর্শ প্রতিষ্ঠান। স্কাউট ও গার্ল গাইডের মূলমন্ত্র হচ্ছে ‘সদা প্রস্তুত’। প্রত্যেক স্কাউট ও গার্ল গাইড অপরের সেবার জন্য বা যেকোনো ভালো কাজ করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে। ‘সদা প্রস্তুত’ –এর ইংরেজি হলো ‘Be Prepared’ এর অর্থ হতে পারে ‘যেকোনো উদ্দেশ্য, অসম সাহসিকতা নিয়ে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে, সহিষ্ণুতার সাথে, বন্ধুর মতো করে, নিজেকে অন্যের প্রয়োজনে উৎসর্গ করা।’ ‘প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করা’ -এটা হচ্ছে স্কাউট ও গার্ল গাইডদের স্লোগান। ইংরেজিতে বলা হয়, ‘Do a good turn daily’. এটা স্কাউট ও গার্ল গাইডদের একটি বৈশিষ্ট্যও বটে। এই স্লোগান স্কাউট ও গার্ল গাইডদের প্রতিজ্ঞার একটি অংশ হওয়ায় এর গুরুত্ব অনেক। প্রতিদিন বিভিন্নভাবে এই স্লোগানকে বাস্তবায়িত করা যায়। যেমন-

কারো চিঠি লিখে দেওয়া।

কারো চিঠি পোস্ট করে দেওয়া।

ডাকটিকেট কিনে এনে দেওয়া।

স্কাউটকে বাজার করে দেওয়া।

কারো কিছু হারিয়ে গেলে খুঁজে দেওয়া।

অন্ধকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করা।

বুড়ো লোককে এগিয়ে দেওয়া।

পথ থেকে ইট, পাথর, কাঁটা, কলার খোসা তুলে ফেলা।

পথের গর্ত ভরে দেওয়া।

শিশুকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করা।

মুসল্লিদের ওযুর পানি এনে দেওয়া।

মসজিদ ধুয়ে দেওয়া।

পথচারীকে পথ দেখিয়ে দেওয়া।

কাউকে বাসা খুঁজে পেতে সাহায্য করা।

ঝগড়া-বিবাদ থামিয়ে দেওয়া।

কেউ আহত হলে হাসপাতালে নেওয়া।

লাশ দাফনে সাহায্য করা।

কাউকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া।

পশু-পাখিকে অত্যাচার থেকে বাঁচানো।

কাউকে গাড়িতে চড়তে সাহায্য করা।

বন্যার সময় ত্রাণকাজে যোগদান করা।

ঝড়–বিধ্বস্ত বা আগুন লাগা এলাকায় ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করা।

এভাবে ছোট হোক, বড় হোক যেকোনো কাজ করে মানুষের সেবা করাই স্কাউট ও গার্ল গাইডের স্লোগানের মূল উদ্দেশ্য। এই কাজের মধ্য দিয়ে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জিত হয়।

কাজ–১ : ২টি সেবামূলক কাজের বর্ণনা লেখ।

কাজ–২ : প্রতিদিন কী কী ভালো কাজ করা যায় তা পোস্টারে লিখে শ্রেণিকক্ষে টাঙিয়ে রাখ।

পাঠ–৪ : রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের জন্ম ও ইতিহাস : ১৮৫৯ সালের ২৪শে জুন উত্তর ইতালির সলফেরিনো নামক স্থানে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাত্র ১৬ ঘণ্টার এই যুদ্ধে প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্য হতাহত হয়। আহত সৈন্যরা বিনা চিকিৎসায় যুদ্ধক্ষেত্রেই উন্মুক্ত প্রান্তরে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছিল। সেই সময় সুইজারল্যান্ডের এক যুবক জিন হেনরি ডুনান্ট ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়নের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে তিনি ব্যথিত হন এবং তিনি আশেপাশের গ্রামবাসীকে ডেকে এনে আহতদের তাৎক্ষণিক সেবা ও প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাদের জীবনরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এরাই রেড ক্রসের প্রথম স্বেচ্ছাসেবক, যাদের অধিকাংশই ছিলেন মহিলা। ডুনান্ট এই যুদ্ধের ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় স্মৃতি ও তার প্রতিকারের জন্য ১৮৬২ সালে 'এ মেমোরি অব সলফেরিনো' নামে একটি বই রচনা করেন। বইটির মূল কথা ছিল 'আমরা কি পারিনা প্রতিটি দেশে এমন একটি সেবামূলক সংস্থা গঠন করতে, যারা শত্রু–মিত্র নির্বিশেষে আহতদের সেবা করবে।' ১৮৬৩ সালে ৯ ই ফেব্রুয়ারি জিন হেনরি ডুনান্ট চারজন জেনেভাবাসীকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন, যা 'কমিটি অব ফাইভ'

নামে পরিচিত। পরবর্তীতে এই কমিটির নাম পরিবর্তিত হয়ে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি নামে পরিচিত হয়। একই বছর এই কমিটি ১৬টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে জেনেভায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করে। সম্মেলনে ডুনান্টের মহতি প্রস্তাবগুলো গৃহীত হয় এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে রেড ক্রস জন্মলাভ করে। জিন হেনরি ডুনান্ট ১৮২৮ সালের ৮ই মে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১০ সালের ৩০ শে অক্টোবর ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ডুনান্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ৮ই মে তার জন্মদিবস, এই দিনটি বিশ্ব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস হিসাবে পালিত হয়।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মূলনীতি : ১৯৬৫ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের ২০তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নিম্নলিখিত সাতটি মৌলিক নীতি গৃহীত হয়।

১। **মানবতা–** কোনো প্রকার ভেদাভেদ ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সাহায্য করা।

২। **পক্ষপাতহীনতা–** এই আন্দোলন জাতি, গোত্র, ধর্মীয় বিশ্বাস, শ্রেণি বা নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করে।

৩। **নিরপেক্ষতা–** সকলের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন সংঘর্ষকালে কোনো পক্ষ অবলম্বন করে না।

৪। **স্বাধীনতা–** এই আন্দোলন স্বাধীন। মানবসেবামূলক কাজে নিজ নিজ দেশের আইনের অধীনে সরকারের সহায়ক হিসাবে কাজ করে।

৫। **স্বেচ্ছামূলক সেবা–** একটি স্বেচ্ছাসেবামূলক ত্রাণ সংগঠন হিসাবে এই আন্দোলন কোনো প্রকার স্বার্থ বা লাভ অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করে না।

৬। **একতা–** কোনো দেশে কেবল একটিমাত্র রেড ক্রস বা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি থাকবে। দেশের সর্বত্র এর মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত থাকবে।

৭। **সার্বজনীনতা–** সমমর্যাদাসম্পন্ন এবং পরস্পরকে সাহায্যের জন্য সমান দায়িত্ব ও কর্তব্যের অধিকারী জাতীয় সোসাইটিসমূহকে নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট বিশ্বব্যাপী একটি সার্বজনীন আন্দোলন।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি : ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হবার পর সরকারের সহযোগী ত্রাণ সংস্থা হিসাবে বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালের ৩১এ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতির এক আদেশবলে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটিকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭৩ সালের ২০এ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটিকে 'আন্তর্জাতিক কমিটি অব রেড ক্রস' স্বীকৃতি প্রদান করে । একই সময়ে সোসাইটি তৎকালীন

লিগ অব রেড ক্রসের সদস্য পদ লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে ৪ঠা এপ্রিল রাষ্ট্রপতির আদেশের সংশোধনীবলে বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির নাম পরিবর্তন করে 'রেড ক্রিসেন্ট ' করা হয়।

রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের প্রতীক : সেনাবাহিনীর মেডিকেল সার্ভিসসহ যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োজিত চিকিৎসা, ত্রাণকর্মী ও তাদের সরঞ্জামাদি চিহ্নিতকরণ ও নিরাপত্তা প্রদানের জন্য একটি নিরপেক্ষ ও পার্থক্যসূচক চিহ্ন হিসাবে রেড ক্রস প্রতীক গৃহীত হয়। রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত ও যুদ্ধাহতদের সেবা প্রদানের অনন্য অবদানের জন্য সুইস নাগরিক হিসাবে হেনরি ডুনান্ট ও তার সহকর্মীবৃন্দ এবং সুইজারল্যান্ড রাষ্ট্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সুইস পতাকার বিপরীতে সাদা জমিনের উপর লাল ক্রস প্রতীক হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। বর্তমানে ফার্মেসি, অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতালসমূহে এবং চিকিৎসকদের জন্য নিম্নের প্রতীক ব্যবহারের লক্ষ্যে ব্যাপক গণসংযোগ পরিচালিত হচ্ছে।

রেড ক্রিসেন্ট পতাকার মাপ : সাদা জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে ইংরেজি ' C ' অক্ষর আকৃতির একটি লাল রংয়ের অর্ধ চন্দ্রখচিত রেড ক্রিসেন্ট পতাকার মাপ নিম্নরূপ :

১। সাদা জমিনের দৈর্ঘ্য ১০ একক, প্রস্থ ৬ একক অর্থাৎ দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬ (জাতীয় পতাকার অনুরূপ)।

২। রেড ক্রিসেন্ট প্রতীকটি ১ একক = সাদা জমিনের প্রস্থের ২৪ ভাগের ১ অংশ হিসাবে অংকন করতে হবে।

রেড ক্রিসেন্ট পতাকা

৩। রেড ক্রিসেন্ট প্রতীকটি সাদা জমিনের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপিত হবে।

৪। লাল অর্ধ চন্দ্রের (রেড ক্রিসেন্ট) খোলা মুখ ফ্ল্যাগ পোলের বিপরীত দিকে থাকবে।

মানবসেবায় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির গুরুত্ব : বিশ্বের দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সংস্থার নাম রেড ক্রস। বর্তমানে এ সংস্থাটি দুটি নামে বিভক্ত। মুসলিম বিশ্বে রেড ক্রিসেন্ট এবং অন্যান্য দেশে রেড ক্রস নামে পরিচিত। মুসলিম বিশ্বে এর প্রতীক অর্ধাকৃতি চাঁদ। যুদ্ধবন্দী, যুদ্ধাহত, বাস্তুহারা,

রুগ্ণ ও যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষকে উদ্ধার ও সহযোগিতা করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এ ছাড়া রয়েছে ব্লাড ব্যাংকের রক্ষণাবেক্ষণসহ পানির বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দান। এ সেবা সংস্থাটি ১৯৬৩ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পায়।

কাজ–১ : মানব সেবায় রেড ক্রিসেন্টের গুরুত্ব উপস্থাপন কর।

কাজ–২ : রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পতাকা বাড়ি থেকে অংকন করে আনবে।

পাঠ–৫ : প্রাথমিক চিকিৎসা : শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলতে সাধারণত হাত, পা, নাক, কান, চোখ, মাথা, গলা ইত্যাদিকে বোঝায়। শিক্ষার্থীদের এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা অতীব প্রয়োজন। প্রতিটি মানুষ জীবনে চলার পথে অনেক সময় দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়। এই দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার ধারণা লাভ করা প্রত্যেকের কর্তব্য। প্রাথমিক চিকিৎসা জানা থাকলে ডাক্তার না আসা পর্যন্ত দুর্ঘটনার ক্ষতির পরিমাণ অনেকটা কমানো যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার ইংরেজি হলো ফার্স্ট এইড (First Aid)। First অর্থ প্রথম আর Aid অর্থ সাহায্য। কোনো আহত ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম যে সেবা শুশ্রূষা দেওয়া হয়, তাই প্রাথমিক চিকিৎসা। প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত সেই শিক্ষা, যা আয়ত্তে থাকলে আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনায় সাহায্য করতে পারে, যাতে রোগীর জীবন রক্ষা পায়। প্রাথমিক চিকিৎসার স্রষ্টা হলেন ডা. ফ্রেডিক এজমার্ক। তিনি জার্মানির একজন বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক। তিনিই প্রথম চিন্তা করেন, যেকোনো দুর্ঘটনায় আহত রোগীকে ডাক্তারের নিকট নিয়ে যাওয়ার আগে রোগীর অবস্থার অবনতি যাতে না ঘটে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অতএব প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে, হঠাৎ দুর্ঘটনায় আহত রোগীকে ডাক্তার আসার পূর্বে প্রাথমিক সেবা শুশ্রূষা করা। প্রাথমিক চিকিৎসাকারীর কাজ প্রধানত তিনটি- ক) রোগ নির্ণয় করা খ) চিকিৎসা গ) স্থানান্তর।

ক. রোগ নির্ণয় : কী কারণে অসুস্থতার সৃষ্টি হয়েছে তা খুঁজে বের করা।

খ. চিকিৎসা : ডাক্তার আসার আগে রোগীর অবস্থার অবনতি যাতে না ঘটে সেজন্য প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া।

গ. স্থানান্তর : দুর্ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী রোগীকে নিরাপদ জায়গায় বা ডাক্তারের নিকট বা হাসপাতালে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্থানান্তর করা।

ক্ষতস্থান : ছুরি, কাঁচি, ব্লেড, দা, বটি প্রভৃতিতে কেটে গিয়ে রক্তপাত হলে তাকে ক্ষত বলা হয়। হাতুড়ি, ইট, পাথরে থেঁতলে গিয়ে রক্তপাত হলে তাকেও ক্ষত বলা হয়। জীবজন্তুর কামড়ে রক্তপাত হলেও ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এছাড়া উত্তপ্ত তেল বা পানি দ্বারা শরীর ঝলসে গিয়ে ত্বক বা মাংসপেশিতে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা :

১। প্রথমেই নিজের হাত জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

২। ক্ষতস্থানে বরফ দিয়ে অথবা অন্য কোনো উপায়ে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে।

৩। রোগীকে নিশ্চলভাবে শুইয়ে রাখতে হবে। এতে রক্তপাত কম হয়।

৪। ক্ষতস্থানে কিছু থাকলে তা বের করতে হবে।

৫। ক্ষতস্থানে বড় কিছু ঢুকে গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের নিকট নিয়ে যেতে হবে।

৬। ক্ষতস্থান জীবাণুনাশক ওষুধের সাহায্যে পরিষ্কার করে ড্রেসিং করতে হবে।

ড্রেসিং : ক্ষতস্থানকে জীবাণুমুক্ত বা পরিষ্কার করার জন্য যে প্রক্রিয়া তাকে ড্রেসিং বলে। ডেসিং এর জন্য পরিষ্কার কাপড়, গজ, ব্যান্ডেজ, তুলা, সেভলন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

ড্রেসিং করার পদ্ধতি : ড্রেসিং করার সময় কতকগুলো বিষয় সবসময় অনুসরণ করতে হয়।

১। রোগীকে শুইয়ে ক্ষতস্থান সামনে তুলে ধরতে হবে।

২। আহত স্থানের নিচে পরিষ্কার কাপড় পেতে দিলে ভালো হয়।

৩। সেবাদানকারীকে তাঁর নিজের হাত দুটি পরিষ্কার করে নিতে হবে।

৪। জীবাণুমুক্ত তুলা দিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে নিতে হবে।

৫। ক্ষতের চারপাশ স্পিরিট বা ডেটল দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

৬। ক্ষতস্থান পরিষ্কার করার সময় কেন্দ্রের দিক থেকে পরিষ্কার করতে হবে। যাতে কোনো ময়লা ক্ষতস্থানে গড়িয়ে না আসে।

৭। ক্ষতস্থানে কখনো হাত লাগাতে নেই।

৮। অ্যান্টিসেপটিক পাউডার বা মলম জীবাণুমুক্ত তুলা বা গজে লাগিয়ে ক্ষতস্থানে চাপা দিলে ভালো হয়।

৯। টিংচার আয়োডিন, স্পিরিট, পটাশ পারম্যাঙ্গানেট প্রভৃতি কোনো ক্ষতে ব্যবহার করা ঠিক নয়। এতে দেহের টিস্যুগুলোর ক্ষতি হয়। ক্ষতের চারপাশ পরিষ্কার করতে এগুলো কাজে লাগে।

১০। প্রাথমিক চিকিৎসকের ব্যাগে সব সময় জীবাণুমুক্ত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ, ফাস্ট এইড বক্স, কাঁচি ও কিছু ওষুধ প্রভৃতি রাখা দরকার।

কাজ – ১ : শ্রেণি কক্ষে যেকোনো একটি দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা অভিনয় করে দেখাও।

পাঠ–৬ : ব্যান্ডেজ : ড্রেসিংকে ঠিকমতো ধরে রাখার জন্য ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করা হয়। ব্যান্ডেজ করার সময় সব সময় মনে রাখতে হবে-

১। ব্যান্ডেজ যেন পুরো ড্রেসিংটাকে ধরে রাখতে পারে।

২। ব্যান্ডেজ যেন আলগা না হয় বা বেশি জোরে লাগানো না হয়।

৩। আহত অঙ্গের তুলনায় ব্যান্ডেজের মাপ যেন বেশি চওড়া বা বেশি সরু না হয়। ব্যান্ডেজ বিভিন্ন মাপের হয়। আহত অঙ্গ অনুযায়ী নির্দিষ্ট মাপের ব্যান্ডেজের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। সাধারণ ক্ষেত্রে শক্ত কাপড়ের ব্যান্ডেজই ব্যবহার করা ভালো।

৫। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইলাস্টিক (Elastic) ক্রেপ ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়।

ব্যান্ডেজ তিন প্রকার :

১। ট্রায়াঙ্গুলার বা ত্রিকোণাকৃতি ব্যান্ডেজ (Traiangular Bandage)

২। রোলার ব্যান্ডেজ (Rollar Bandage)

৩। বিশেষ ব্যান্ডেজ- যেমন মাল্টি টেইল (Multi tail) ব্যান্ডেজ।

ট্রায়াঙ্গুলার বা ত্রিকোণাকৃতি ব্যান্ডেজ (Triangular Bandage) : প্রাথমিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। একটি চারকোনা কাপড়ের মাঝখান দিয়ে কোনাকুনিভাবে কেটে নিলে ত্রিভুজ ব্যান্ডেজ তৈরি হবে, যার মাপ হবে মোট ৪২˝ ইঞ্চির মতো। ১ মিটার মাপের কাপড় নিলেও চলবে।

রোলার ব্যান্ডেজ (Rollar Bandage) : সাধারণত হাসপাতালে বা অভিজ্ঞ প্রাথমিক চিকিৎসকেরা রোলার ব্যান্ডেজ ব্যবহার করে। রোলার ব্যান্ডেজ বিভিন্ন আকৃতির হয়। এটি এক ইঞ্চি চওড়া থেকে ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়া হয়। খেলোয়াড়দের দেহে আঘাত লাগলে ক্রেপ রোলার ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়।

মাল্টি টেইল ব্যান্ডেজ (Multi tail Bandage) : অনেক লেজবিশিষ্ট ব্যান্ডেজকে মাল্টি টেইল বা বহু প্রান্তিক ব্যান্ডেজ বলে, যা দেখতে 'T' আকৃতির হয়।

হাতের ব্যান্ডেজ (Hand Bandage) : হাতের ক্ষতস্থানে ড্রেসিংয়ের উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রোলার ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয়। ড্রেসিং ঢেকে গেলে ব্যান্ডেজ শেষ হবে এবং সেফটিপিন দিয়ে এঁটে দিতে হবে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ড্রেসিংয়ের উপরে কীভাবে ব্যান্ডেজ করা হচ্ছে তা দেখানো হলো-

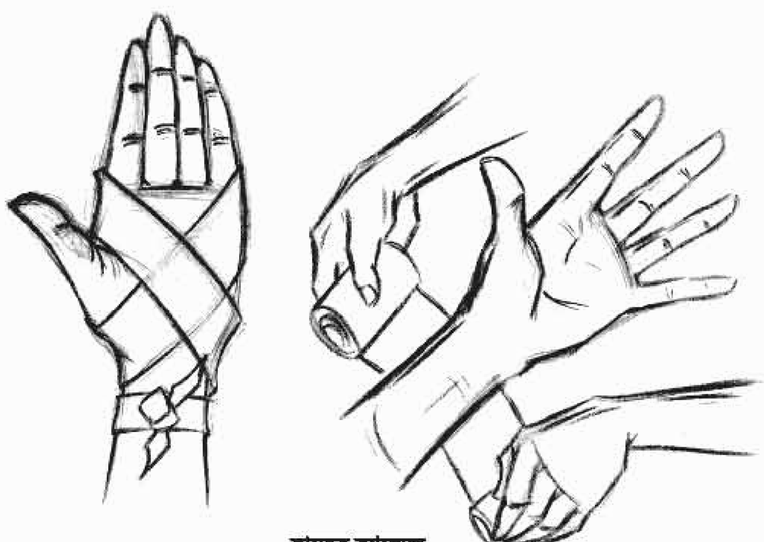

হাতের ব্যান্ডেজ

মাথার ব্যান্ডেজ (Skull Bandage) : মাথার খুলিতে আঘাত লাগলে ক্ষতস্থানে রিং প্যাড দিয়ে ঢেকে একটা ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ নিয়ে মাথার চারদিকে ঘুরিয়ে কপালের উপর বাঁধতে হবে।

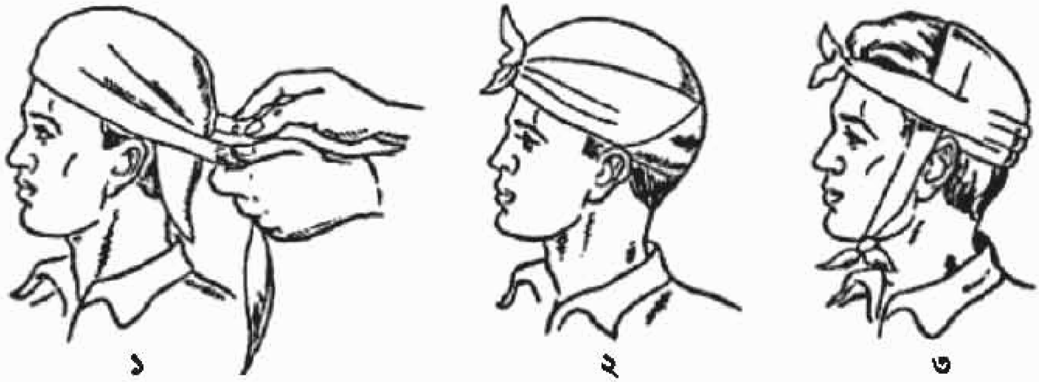

মাথার ব্যান্ডেজ

১। মাথায় চওড়া ব্যান্ডেজ ব্যবহার করতে হয়।

২। কপালের ক্ষতস্থান থেকে ব্যান্ডেজ শুরু করতে হয়।

৩। ধীরে ধীরে ব্যান্ডেজ পেঁচিয়ে ড্রেসিং ঢেকে দিতে হবে।

৪। কপালের ব্যান্ডেজ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাঁধতে হবে।

চোয়ালের ব্যান্ডেজ (Jaw Bandage) : T ব্যান্ডেজ একটি বিশেষ ধরনের ব্যান্ডেজ, যাতে দুটি প্রান্তের বদলে তিনটি প্রান্ত থাকে। বিশেষ করে চোয়ালে এ ব্যান্ডেজ ব্যবহৃত হয়। এই ব্যান্ডেজ দ্বারা চোয়ালে ব্যান্ডেজ কীভাবে শুরু করা হয় এবং কীভাবে শেষ হয় চিত্রে তা দেখানো হলো।

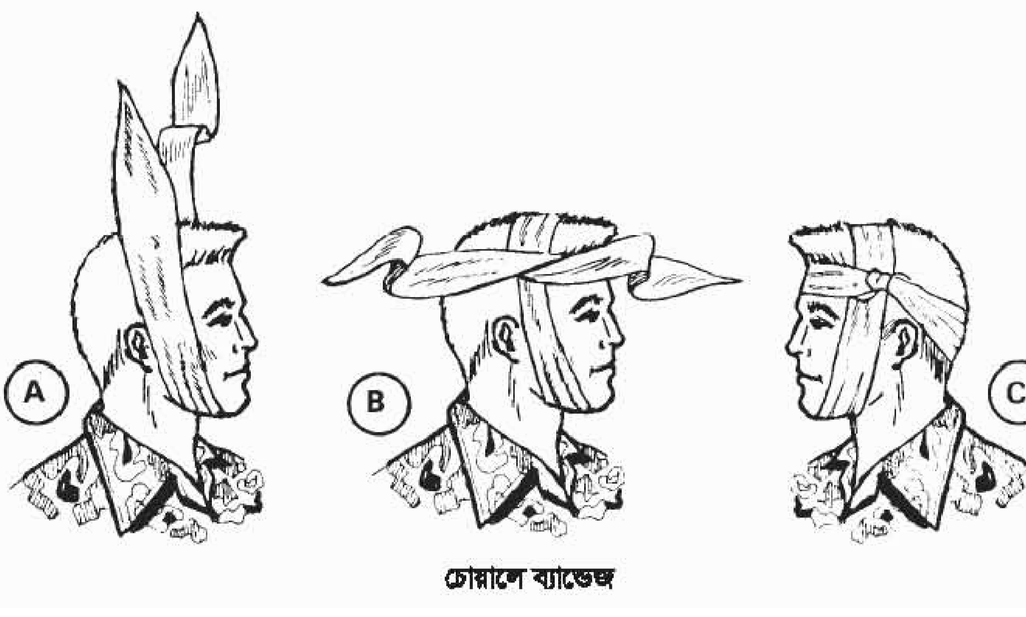

চোয়ালে ব্যান্ডেজ

কাজ–১ : ব্যান্ডেজ করার সময় কী কী জিনিস মনে রাখতে হবে তা লেখ।

কাজ–২ : স্কাল ও জ ব্যান্ডেজ কীভাবে বাঁধতে হয় তা শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন করে দেখাও।

পাঠ–৭ : আর্ম স্লিং ও কলার এন্ড কাফ স্লিং : হাতের কোনো হাড় ভেঙে গেলে বা হাতে জোরে আঘাত লাগলে তাকে অনড় করে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এই ঝুলিয়ে রাখার জন্য ব্যান্ডেজ দিয়ে যে বাঁধন দেওয়া হয় তাকে স্লিং বলে।

আর্ম স্লিং : সম্পূর্ণ বাহু বেঁধে ঝুলিয়ে রাখাকে স্মল আর্ম স্লিং বলে। বাহুর অগ্রভাগ আরামে ঝুলিয়ে রাখার জন্য আর্ম স্লিংয়ের প্রয়োজন। একটি নির্ভাজ ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ নিয়ে তার এক প্রান্ত কাঁধের উপর স্থাপন করতে হবে।

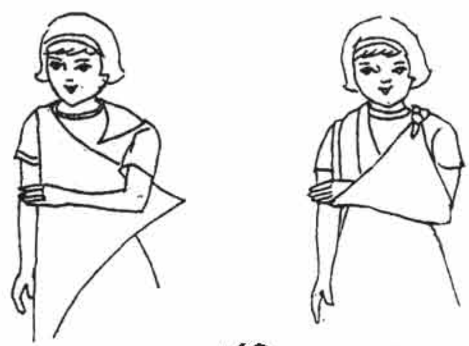

আর্ম স্লিং

গলার পিছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে আহত অংশের কাঁধের দিকে আনতে হবে এবং বুকের সম্মুখভাগে অন্য প্রান্তটি ঝুলিয়ে দিতে হবে। অতঃপর ব্যান্ডেজের মধ্যস্থলে আহত বাহুখানি রেখে শীর্ষদিক কনুইয়ের পিছন দিকে নিয়ে যেতে হবে। এবার দ্বিতীয় প্রান্তটিকে প্রথমটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। শীর্ষদিক কনুই পর্যন্ত ভাঁজ করে এনে দুটি সেফটিপিনের সাহায্যে ব্যান্ডেজের সম্মুখভাগ সংযুক্ত করে দিতে হবে।

কলার এন্ড কাফ স্লিং : হাতের কব্জি ঝুলিয়ে রাখার জন্য কলার এন্ড কাফ স্লিং ব্যবহার করা হয়। এই স্লিং ব্যবহার করতে হলে আঙ্গুলগুলো অপর কাঁধ স্পর্শ করতে পারে এমনভাবে কনুই বেঁধে হাতটি বুকের উপর রাখতে হবে। অতঃপর হাতের কব্জিতে ব্যান্ডেজ দিয়ে ক্লোভ হিচ গিট দিতে হবে। ব্যান্ডেজের শেষ প্রান্ত এর সাথে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে দিতে হবে। একটি সরু ব্যান্ডেজ দিয়ে ক্লোভ হিচ প্রস্তুত করতে হবে। দুটি লুপ তৈরি করে দ্বিতীয়টি প্রথমটির উপর রাখতে হবে। অতঃপর উপরের লুপটি প্রথমটির পিছন দিয়ে ক্লোভ হিচ প্রস্তুত করতে হবে। তারপর হাতের কব্জির ভিতর দিয়ে শক্ত করে গলার সাথে বেঁধে দিতে হবে।

কলার এন্ড কাফ স্লিং

কাজ–১ : আর্ম স্লিং ও কলার এন্ড কাফ স্লিং অনুশীলন করে দেখাও।

কাজ–২ : একে অপরকে আর্ম স্লিং ও কলার এন্ড কাফ স্লিং বেঁধে দেখাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হাইকিং কোন ধরনের কর্মসূচি?

ক. রাজনৈতিক
খ. সামাজিক
গ. শিক্ষামূলক
ঘ. উন্নয়নমূলক

২. প্রাথমিক চিকিৎসার কথা সর্বপ্রথম কে বলেছেন?

ক. ডা. ফেড্রিক এজমার্ক
খ. ড. জেমস নেইসমিথ
গ. জিন হেনরি ডুনান্ট
ঘ. লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল

৩. হাতের কব্জি ঝুলিয়ে রাখতে কোন ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়?

ক. কলার এন্ড কাফ স্লিং
খ. আর্ম স্লিং
গ. মাল্টিটেইল
ঘ. ট্রায়াঙ্গুলার

৪. হাইকিংয়ের সফলতা নির্ভর করে কোনটির উপর?

ক. পরিকল্পনা
খ. তাবু জলসা
গ. কম্পাস
ঘ. মানচিত্র

৫. সাধারণত ক্ষতস্থানে কোনটি ব্যবহার করা ভালো?

ক. স্পিরিট
খ. পটাসিয়াম পারম্যাংগানেট
গ. টিঞ্চার আয়োডিন
ঘ. অ্যান্টিসেপটিক পাউডার

৬. মাল্টিটেইল ব্যান্ডেজ–

i. সাধারণত চোয়ালের ক্ষতে ব্যবহৃত হয়
ii. কপালে ব্যবহার করা হয়
iii. বহু প্রান্তিক বা T আকৃতির হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও iii
ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রানু ছোট বেলা হতেই পরোপকারী। মানুষের কষ্ট তার ভালো লাগে না। কীভাবে সে মানুষকে তাদের বিপদে আপদে সাহায্য করবে প্রায়ই এ বিষয়ে বাবা মাকে প্রশ্ন করে। বাবা বললেন, তোমাদের মাদরাসাতেই অনেক সেবামূলক সংগঠন আছে। শিক্ষকদের সাথে পরামর্শ করে যেকোনো একটির সদস্য হয়ে যাও।

৭. রানুর জন্য সুবিধাজনক সেবামূলক সংগঠন কোনটি?

ক. স্কাউট
খ. গার্ল গাইড
গ. রেড ক্রস
ঘ. রেড ক্রিসেন্ট

৮. সেবামূলক সংগঠনের সদস্য হলে রানুর যা করার সম্ভাবনা তা হলো–

i. শিশু ও বয়স্কদের প্রয়োজনে রাস্তা পারাপারে সাহায্য করা
ii. হারিয়ে যাওয়া শিশুদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া
iii. আহত কাউকে হাসপাতালে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আরিতা মাদরাসা থেকে বাড়িতে আসার পর বিকালে মাঠে খেলতে গিয়েছিল। খেলার সময় ইটের উপর পড়ে গিয়ে পা কেটে যায় এবং রক্তক্ষরণ শুরু হয়। আরিতার বন্ধুরাই তাকে সহযোগিতার জন্য দৌড়ে আসে এবং তাদের সঙ্গে যা ছিল তা দিয়ে প্রথমে রক্ত পড়া বন্ধ করে তারপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

৯. আরিতার বন্ধুদের সম্পাদিত কাজটি কী?

ক. হাতুড়ে চিকিৎসা
খ. প্রাথমিক চিকিৎসা
গ. পর্যবেক্ষণ
ঘ. চিকিৎসা

১০. আরিতার বন্ধুদের মতো সবার করণীয়–

i. ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করা
ii. ক্ষতস্থানে কিছু থাকলে বের করে দেওয়া
iii. ক্ষতস্থানে ম্যাসেজ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

২০২১

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আরিক তার মাদরাসায় একটি সংগঠনের সাথে জড়িত। এই সংগঠনের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সর্বদা কাজের জন্য প্রস্তুত থাকা। সংগঠনটি সাতটি আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই সংগঠনটির কর্মকান্ডের ফলে তার মাদরাসায় শিক্ষার্থী ভর্তির হার আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।

১১. আরিক কোন সংগঠনের সাথে জড়িত?

ক. গার্ল গাইড
গ. রেড ক্রিসেন্ট
খ. স্কাউট
ঘ. রেড ক্রস

১২. আরিকের সংগঠনটির সফল বাস্তবায়ন হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে–

i. মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে

ii. সমাজে সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে

iii. গোষ্ঠীগত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
গ. ii ও iii
খ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হাইকিং পরিশ্রমের হলেও আনন্দদায়ক– ব্যাখ্যা কর।

২. নির্ভুল পরিকল্পনার মাধ্যমে হাইকিং আনন্দদায়ক হয়– ব্যাখ্যা কর।

৩. স্কাউট আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজে অবদান রাখা সম্ভব– ব্যাখ্যা কর।

৪. রেড ক্রিসেন্টের সদস্য হলে মানবসেবার সুযোগ পাওয়া যায়– মতামত দাও।

৫. প্রাথমিক চিকিৎসা অনেক মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারে– ব্যাখ্যা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পরিচিতি ও স্বাস্থ্যসেবা

মানবদেহকে ঘিরে প্রতিনিয়ত যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়, সুন্দর জীবনযাপনের জন্য সেসব সমস্যার সমাধান করতে হয়। এজন্য দৈহিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞানের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ, মানবশরীর যেসব প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য যথাসময়ে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মানুষের জীবন ধ্বংসের জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। সচেতন মানবসমাজ তার মোকাবিলা করে সেসব রোগের প্রতিষেধক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। ঘাতক ব্যাধি এইডস বর্তমানে সারা বিশ্বে আশঙ্কাজনকভাবে বিস্তার লাভ করে চলেছে। এইডস রোগের কোনো প্রতিষেধক বা সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করতে পারে এমন ওষুধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। অকালমৃত্যুই এইডস রোগীর শেষ পরিণতি। তাই এইচআইভি ও এইডস কী, কীভাবে এ রোগ সংক্রমিত হয়, এ রোগের লক্ষণ, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কী প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা ও সকলকে সচেতন করা প্রয়োজন।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে এইচআইভি ও এইডসের পরিণতি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- এইচআইভি ও এইডস কীভাবে ছড়ায় তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- এইচআইভি ও এইডস হতে মুক্ত থাকার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- এইচআইভি ও এইডসের ক্ষতিকর প্রভাব জেনে এর প্রতিরোধে সচেতন হতে পারব।

২০১৫

পাঠ–১ : এইচআইভি ও এইডসের (HIV and AIDS) ধারণা ও প্রভাব : বর্তমান বিশ্বে যে কয়েকটি ঘাতক ব্যাধিতে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, তার মধ্যে এইডস (AIDS) একটি। বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশেও এইডস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। তাই, এইডস সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই জানা প্রয়োজন। এইডস চারটি ইংরেজি শব্দ, যার পূর্ণরূপ হলো– Acquired Immune Deficiency Syndrome-এর প্রত্যেকটির প্রথম অক্ষর নিয়ে AIDS গঠিত। এইডস এক ধরনের ভাইরাসজনিত রোগ। এই ভাইরাসটির নাম এইচআইভি (HIV), যার পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি রূপ হলো Human Immuno deficiency Virus (HIV)। বিভিন্ন উপায়ে এই ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশ করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে দেয়। এইচআইভি সংক্রমণের ফলে যে রোগ হয় তা হলো এইডস। এর কোনো কার্যকর প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি বলে একে ঘাতক বা মরণব্যাধি বলা হয়।

এইচআইভি ও এইডস এর প্রভাব : এর প্রভাব মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনে। স্বাস্থ্যব্যবস্থায় যেমন এইচআইভি ও এইডস এর ক্ষতিকর দিক রয়েছে তেমনি পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এইচআইভি বিস্তারের মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে।

স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর প্রভাব : কারো দেহে এইচআইভি ভাইরাস প্রবেশ করলে তা সারাজীবন শরীরের মধ্যে থাকে। আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক বা তার ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যের শরীরেও ভাইরাসটি ছড়ায়। স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য এটা মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এইডসের কোনো প্রতিষেধক না থাকায় এ রোগে আক্রান্ত হলে রোগী ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। এতে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যব্যবস্থায় অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে।

পরিবারের উপর প্রভাব : এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি জীবিত থাকা অবস্থায় তাকে পরিবারের লোকজন, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই এড়িয়ে চলে। সে ও তার পরিবারকে সামাজিকভাবে হেয় হতে হয়। তার চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়। ফলে পরিবারে আর্থিক অনটন দেখা দেয়। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আক্রান্ত ব্যক্তি মারা গেলে তার ছেলেমেয়েরা এতিম হয়ে অবহেলা-অনাদরে বড় হতে থাকে। তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়, এমনকি অর্থাভাবে অনেকের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়।

অর্থনৈতিক প্রভাব : এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি কর্মরত থাকলে তাকে কাজ বা চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির কর্মক্ষমতা কমে যায়। ফলে সে ঠিকমত কাজকর্ম বা আয়-রোজগার করতে পারে না। এতে ঐ ব্যক্তির পরিবারের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। যেসব দেশে এইডসের প্রকোপ বেশি, সেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থবিরতা নেমে আসে।

পাঠ–২ : এইচআইভি যেভাবে মানবদেহে সংক্রমিত হয় : এইচআইভি ভাইরাস সাধারনত মানবদেহে যেভাবে ছড়ায় তা হচ্ছে রক্ত, দৈহিক মিলন, মায়ের বুকের দুধের মাধ্যমে। এছাড়াও এইচআইভি সুনির্দিষ্টভাবে যেসব উপায়ে ছড়ায়, তা হলো:

(১) এইডস আক্রান্ত রোগীর রক্ত কোনো ব্যক্তির দেহে পরিসঞ্চালন করলে।

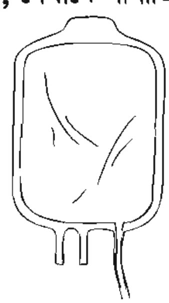

দূষিত রক্ত গ্রহণ

(২) আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত সুচ বা সিরিঞ্জ অন্য কোনো ব্যক্তি ব্যবহার করলে।

(৩) আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো অঙ্গ বা দেহকোষ অন্য ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে।

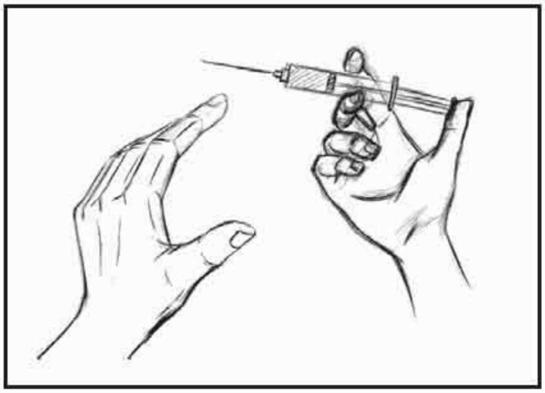

আক্রান্ত ব্যক্তির সুচ/সিরিঞ্জ ব্যবহার

আক্রান্ত মায়ের দুগ্ধপান

(৪) আক্রান্ত মায়ের মাধ্যমে (গর্ভধারণকালীন সময়ে, মায়ের দুধ পান করার ফলে) শিশু এই রোগে সংক্রমিত হতে পারে।

(৫) অনৈতিক ও অনিরাপদ দৈহিক মিলন ঘটলে।

এইডসের লক্ষণসমূহ :

এইডসের নির্দিষ্ট কোনো লক্ষণ নেই। তবে, এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি অন্য যে রোগে আক্রান্ত হয়, সে লক্ষণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

১. শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস পাওয়া ;

২. অজানা কারণে দুই মাসের অধিক সময় জ্বর থাকা ;

৩. দীর্ঘদিন ধরে শুকনো কাশি থাকা ;

৪. দুই মাসের অধিক সময় ধরে পাতলা পায়খানা

৫. শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছত্রাকজনিত সংক্রমণ দেখা দেওয়া ;

৬. লসিকা গ্রন্থি (Lymph Gland) ফুলে যাওয়া।

এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাধারণত উপরে বর্ণিত একাধিক লক্ষণ দেখা যেতে পারে। এ জন্য তার এইডস হয়েছে নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যাবে না। তবে কোনো ব্যক্তির এসব লক্ষণ দেখা দিলে বিলম্ব না করে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করে এইচআইভি সংক্রমণের বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

কাজ–১ : এইডস রোগীকে কীভাবে শনাক্ত করা যায় তা ব্যাখ্যা কর।

পাঠ–৩ : এইচআইভি (HIV) ও এইডস (AIDS) সংক্রমণের ঝুঁকি : বিশ্বে যে কয়েকটি ঘাতক ব্যাধিতে মানুষ অধিক সংখ্যায় আক্রান্ত হচ্ছে এর মধ্যে এইডস অন্যতম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮১ সালে সর্বপ্রথম এইডস শনাক্ত হয়। বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক বা নিরাময়ব্যবস্থা থাকলেও এইডস সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করতে পারে এমন ওষুধ এখনও আবিষ্কার হয় নি। এইডস হলো এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণের সর্বশেষ পর্যায়। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি অতি সহজেই অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয় এবং কোনো চিকিৎসায় ভালো হয় না। এইচআইভি ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশ করে দেহের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয় বলে এর একমাত্র পরিণতি মৃত্যু।

এইচআইভি ও এইডস বিস্তারে বাংলাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থান : এইচআইভি ও এইডস সমগ্র বিশ্বে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এর বিস্তার আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি। পূর্ব ইউরোপ ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে এর দ্রুত বিস্তার ঘটেছে। এশিয়া মহাদেশে ভারত ও মিয়ানমারে এইডসের ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশি। চীন, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও নেপালে এর বিস্তার ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এইডস আক্রান্ত দেশসমূহে বাংলাদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক যায়। অনৈতিক জীবনযাপনের ফলে তাদের এইডসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। এই সকল শ্রমিকেরা অনেক সময় এইচআইভি ভাইরাস নিজেদের শরীরে বহন করে দেশে ফিরে আসছে। এছাড়া আমাদের দেশে অনিয়ন্ত্রিত মাদকের ব্যবহার, অসচেতনতা, অশিক্ষা, অনৈতিকতা, দারিদ্র্য প্রভৃতি কারণে ২৫ বছরের কম বয়সী কিশোর-কিশোরী/ যুবক-যুবতীদের মধ্যে এইডস সংক্রমণের ব্যাপকতা মহামারী আকারে পৌঁছে গিয়েছে।

অল্প বয়সী মেয়েরা এইচআইভি সংক্রমণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ : যেহেতু প্রতিকারবিহীন এ রোগের পরিণতি ভয়াবহ, তাই বিশেষ করে অল্প বয়সী মেয়েদেরকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে এবং সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিভিন্ন দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি থেকে জানা যায় যে নতুন এইচআইভি আক্রান্তদের অর্ধেকই ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী। এই বয়সী মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অধিক ঝুঁকিতে রয়েছে। এর প্রধান কারণগুলো হচ্ছে–

(১) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে মেয়েদের দুর্বল অবস্থান (২) এইচআইভি ও এইডস সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব (৩) নারী-পুরুষের বৈষম্যের কারণে নারীর নিগৃহীত হওয়া (৪) অনৈতিক ও অনিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে মেয়েদের বাধাদানের ক্ষমতার অভাব (৫) মেয়েদের বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্য (৬) অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক ইত্যাদি।

২০২৫

এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে করণীয়–

- অপরীক্ষিত রক্ত গ্রহণ করা যাবে না ;
- অন্যের ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ব্যবহার করা যাবে না ;
- অন্যের ব্যবহৃত ব্লেড বা রেজার ব্যবহার করা যাবে না ;
- অনৈতিক, অনিরাপদ ও অনিয়ন্ত্রিত শারীরিক সম্পর্ক করা যাবে না ;
- অপারেশনে পরিশুদ্ধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে ;
- শিশুকে এইচআইভি জীবাণুবাহী বা এইডসে আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো যাবে না।

এছাড়াও এইচআইভি সংক্রমণের কারণগুলো জেনে এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে আমরা এইডস প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে পারি। এইডস প্রতিরোধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হলো-

১. **ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার :** এইচআইভি ও এইডসের ঝুঁকি প্রতিরোধ করতে হলে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণগুলো পরিহার করতে হবে।

২. **আবেগ প্রশমন :** প্রধানত কৌতূহল ও আবেগের বশবর্তী হয়ে কিশোর-কিশোরীরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে। অনেক সময় মা-বাবার শাসনের ফলে রাগ বা অভিমান করে তারা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে বসে। বড়দের সাথে বিশেষ করে মা-বাবার সঙ্গে খোলামেলা কথা বললে সহজে আবেগ প্রশমিত ও কৌতূহল দূর হয় এবং এতে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

৩. **ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান :** ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্য 'না' বলার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। কিশোর-কিশোরীরা অনেক ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত বা অনৈতিক প্রস্তাবে চক্ষু লজ্জায় বা ভয়ে সরাসরি 'না' বলতে পারে না। তাই কীভাবে 'না' বলতে হবে তা জানতে ও শিখতে হবে। নিজেকে দৃঢ়চেতা হতে হবে এবং বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার যুক্তি দেখাতে হবে এবং প্রস্তাবের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরতে হবে। সর্বোপরি 'না' বলার কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

৪. **ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন ও রীতিনীতি মেনে চলা :** নেশা করা বা মাদকাসক্ত হওয়া ও অনৈতিক দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন কোনো ধর্ম বা সমাজ অনুমোদন করে না। সামাজিকভাবে এগুলো অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। তাই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে এইডসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক কমে যায়।

৫. **এইচআইভি ও এইডস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি :** এইচআইভি ও এইডসের ভয়াবহতা সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে র‌্যালির আয়োজন, পত্রিকায় প্রচার, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, নাটক ও সংগীত প্রভৃতির মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টার একই রঙের পোশাক প্রভৃতিতে সজ্জিত হয়ে স্লোগান সহকারে র‌্যালিতে অংশ নিলে তা সহজেই দর্শকের নজর কাড়ে এবং এইডস বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কাজ–১ : এইচআইভি/এইডস এর যেকোনো একটি ঝুঁকিপূর্ণ কারণ চিহ্নিত করে তা এড়ানোর কৌশলসমূহ দলে বিভক্ত হয়ে লেখ ও শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

কাজ–২ : এইডস থেকে ঝুঁকিমুক্ত থাকতে শিক্ষার্থীদের কী কী করণীয় তা চিহ্নিত করে দলীয় কাজ হিসাবে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

কাজ–৩ : কোন কোন কৌশলের মাধ্যমে সহপাঠী বা সমবয়সীদের এইডস প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করা যায়, সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. এইডস সর্বপ্রথম কত সালে শনাক্ত হয়?

ক. ১৯৮০ গ. ১৯৮২

খ. ১৯৮১ ঘ. ১৯৮৩

২. এইচআইভি কী?

ক. রোগ গ. ব্যাকটেরিয়া

খ. ভাইরাস ঘ. আয়োডিন

৩. সর্বপ্রথম এইডস শনাক্ত হয় কোন দেশে?

ক. আমেরিকা গ. ভারত

খ. ভিয়েতনাম ঘ. কম্বোডিয়া

৪. এইডস প্রতিরোধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কোনটি?

ক. চিকিৎসকদের এইডস সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান

খ. এইডস সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা

গ. এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের সঠিক চিকিৎসা দেওয়া

ঘ. এইডস আক্রান্ত লোকদের চিহ্নিত করা

৫. এইডস আক্রান্ত মায়েদের শিশুর এইডস হতে পারে–

i. মায়ের দুধ পান করলে

ii. মায়ের শ্বাস–প্রশ্বাসের মাধ্যমে

iii. মায়ের রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. i i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৬. এইডস–এর ক্ষেত্রে–

i. এর নির্দিষ্ট কোনো লক্ষণ নেই

ii. এটি একটি নীরব ঘাতক

iii. সঠিক নিয়মে ওষুধ খেলে এটি ভালো হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত আকাশের জরুরি রক্তের প্রয়োজন হলে তৎক্ষণাৎ অপরিচিত একজনের রক্ত আকাশকে দেওয়া হয়। সুস্থ হওয়ার কিছুদিন পর আকাশ এক রোগে আক্রান্ত হয়। এতে তার একটানা জ্বর, কাশি এবং লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যায়।

৭. আকাশ নিচের কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছে?

ক. ক্যান্সার

খ. নিউমোনিয়া

গ. এইডস

ঘ. জন্ডিস

৮. আকাশের রোগটিতে আক্রান্ত হওয়ার কারণ–

i. সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়া

ii. পরীক্ষা ছাড়া রক্ত গ্রহণ

iii. রোগটি সম্পর্কে অসচেতনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. i ও ii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

করিম একটি ফার্মে চাকুরি করেন। দুইমাস ধরে তার জ্বর এবং কাশি থাকায় তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী জামান তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার করিমের রক্ত পরীক্ষা করে জামানকে জানায় করিম এইডস রোগে আক্রান্ত। ভয়ে জামান করিমকে ডাক্তারখানায় রেখে করিমের বাড়ি খবর দেয়। খবরটি শুনে করিমের বাড়ির সবাই করিমের সংগে কেমন যেন আচরণ করতে থাকে। এতে করিম মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে।

৯. জামানের এরূপ আচরণ পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কোনটি?

ক. রোগ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা
গ. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা
খ. আবেগ প্রশমনের ব্যবস্থা করা
ঘ. এইডসের ঝুঁকি এড়িয়ে চলা

১০. করিমের এই মানসিক অবস্থার জন্য দায়ী–

i. পরিবারের অসহযোগিতা
ii. ভাগ্যের নির্মম পরিহাস
iii. রোগটি ছড়ানোর ভয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
গ. ii ও iii
খ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তরল পদার্থের আদান–প্রদানের মাধ্যমেই এইডস ছড়ায়– ব্যাখ্যা কর।

২. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কীভাবে এইডস প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারে? ব্যাখ্যা কর।

৩. কিশোর কিশোরীদের সচেতনতাই এইডস প্রতিরোধ করতে পারে– মতামত দাও।

৪. এইডস আক্রান্ত রোগীর সমস্যা মানে পরিবারেরই সমস্যা– মতামত দাও?

৫. এইডসের চিকিৎসার পরিবর্তে প্রতিরোধই উত্তম– ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

আমাদের জীবনে প্রজনন স্বাস্থ্য

শরীরের যেসব অঙ্গ সন্তান জন্মদানের সঙ্গে সরাসরি জড়িত, সেসব অঙ্গের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়কে প্রজনন স্বাস্থ্য বলে। অনেকে মনে করেন, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে শুধু মেয়েরাই জানবে। এটি একটি ভুল ধারণা। একটি শিশু সে ছেলে কিংবা মেয়ে যে-ই হোক না কেন, জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি স্তরেই তার সাধারণ স্বাস্থ্যের পাশাপাশি প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাই প্রজনন স্বাস্থ্য কী এবং তা কীভাবে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে সবারই জানা প্রয়োজন। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকার কারণে তারা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত অনেক জটিলতার সম্মুখীন হয়। কাজেই এই বয়সের কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা জানতে হবে। পূর্ববর্তী অধ্যায় ও বিভিন্ন পাঠে এটা জানা গেছে যে হরমোনজনিত কারনে বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের কিছু শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। বয়ঃসন্ধিকালে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সময় থেকেই প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। কারণ, এ সময়েই একটি ছেলে ও একটি মেয়ের শরীর যথাক্রমে পুরুষ ও নারীর শরীরে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর এ সময় থেকেই একটি ছেলে ও মেয়ের নিজেদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য প্রজনন স্বাস্থ্যের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুপূর্ণ। তাছাড়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেকেরই প্রজনন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা প্রয়োজন।

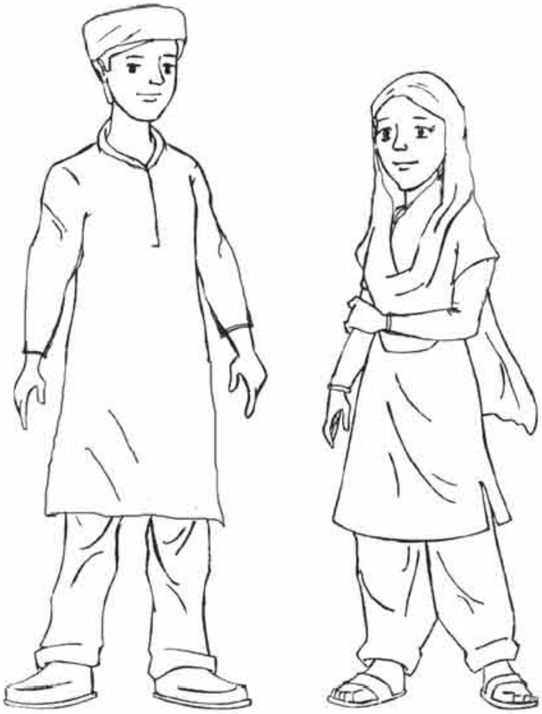

বয়ঃসন্ধিকালের বালক-বালিকা

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রজনন স্বাস্থ্যসংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলাফল বিশ্লেষণ করে এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব;
- প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধিগুলো নিয়মিত পালন করে নিজেকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখতে পারব।

পাঠ–১ : প্রজনন স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ধারণা : একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন থেকে সে ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে উঠে। শিশুটি বয়সের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে বড় হয়। তাকে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব প্রতিটি স্তর পার হয়ে আসতে হয়। শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণকালে তার শারীরিক ও মানসিক নানারকম পরিবর্তন ঘটে। এ সময়টা হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকাল। বয়ঃসন্ধিকালে একটি ছেলে বা মেয়ে যৌবনে পদার্পণ করে। এ সময় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষম বিকাশ সাধন হয়। শরীরের যেসব অঙ্গ সন্তান জন্মদানের সাথে সম্পর্কিত, সেগুলো সুস্থভাবে গঠিত ও বিকশিত হয়ে উঠে। প্রজনন হচ্ছে সন্তান জন্মদানের একটি প্রক্রিয়া। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্য প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পাদনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিরাপদ ও সুস্থ্য জীবনযাপনের জন্য প্রত্যেকেরই এ সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান থাকা জরুরি।

প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা : প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার প্রথম কথা হলো বয়ঃসন্ধিকালে শরীর বৃদ্ধির পাশাপাশি যেসব শারীরিক পরিবর্তন ঘটে, সে বিষয়ে একটি কিশোর বা কিশোরীর করণীয়সমূহ কী তা ভালোভাবে জেনে নেওয়া এবং সে অনুযায়ী নিজেকে লালন করা। এ সময় পুষ্টিকর খাবার খাওয়া ও প্রচুর পানি পান করা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন। কোনো শারীরিক জটিলতা দেখা দিলে স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

আমাদের দেশে প্রতিবছর সন্তান জন্মদান করতে গিয়ে অনেক মা মৃত্যুবরণ করেন। এর কারণ আমাদের দেশের অনেক মেয়েরই অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে হয় ও সন্তান ধারণ করে। ফলে সে বিভিন্ন প্রকার রোগে আক্রান্ত হয় এবং তার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। এতে পরিবারে আর্থিক কষ্ট ও অশান্তি নেমে আসে। পরিণত বয়সে একটি মেয়ের বিয়ে হলে সে শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে সচেতন হয় আবার গর্ভধারণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়। পরিণত বয়সে বিয়ে হলে এবং ২০ বছরের পর গর্ভধারণ করলে প্রসূতি মা ও শিশুর মৃত্যুর ঝুঁকি কম থাকে। তবে ঘন ঘন সন্তান নিলে মা ও শিশুর জীবন ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। এই ঝুঁকি কমানোর জন্য সন্তান জন্মদানের মধ্যে বিরতি দিতে হবে। উপরোক্ত নিয়ম মেনে চললে প্রজনন স্বাস্থ্যের সুস্থতা বজায় থাকবে এবং নবজাতক স্বাস্থ্যবান ও নীরোগ হবে। ফলে পরিবারে ও সমাজে শান্তি বিরাজ করবে।

প্রজনন স্বাস্থ্যসংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি : পূর্ববর্তী পাঠে আমরা প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে জেনেছি। নিরাপদ ও উন্নত জীবনযাপনের জন্য প্রত্যেকেরই প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ, মানুষের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের একটি বিশেষ অংশ হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য। কাজেই প্রজনন স্বাস্থ্য-জ্ঞানের অভাবে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। কিশোর-কিশোরীরা কিছু না বুঝে তাদের প্রজনন অঙ্গের রোগ গোপন করে বিভিন্ন সমস্যায় ভোগে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কৈশোরকালে মেয়েদের ও ছেলেদের দ্রুত শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। ফলে তাদের মধ্যে ভয়, কৌতূহল ও আবেগের সৃষ্টি হয়। আবেগতাড়িত হয়ে তারা অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিজেদের ক্ষতি করে বসে। প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞান থাকলে এসব সমস্যা এড়ানো সম্ভব হয়। প্রজনন স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান –

১। **উপযুক্ত বয়সে গর্ভধারণ :** প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য মেয়েদের ২০ বছর বয়সের আগে গর্ভধারণ করা উচিত নয়। উপযুক্ত বয়সে গর্ভধারণ করলে মা ও শিশু উভয়ই সুস্থ থাকে।

২। **নিরাপদ মাতৃত্ব :** মা ও শিশুর জীবন নিরাপদ রাখার জন্য গর্ভবতী মাকে চলাফেরায় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ। কোনো ভারী জিনিষ উঠানো বা নামানো উচিৎ না। এছাড়া শারীরিক কোনো সমস্যা দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিৎ।

৩। **প্রজননকালীন সতর্কতা :** গর্ভের শিশুর পুষ্টি এবং গর্ভবতী মায়ের সুষম খাদ্য গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়গুলো প্রজনন স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত। এই সকল বিষয়ের উপর যত্নশীল হলে তবেই একটি সুস্থ সন্তান জন্ম দেওয়া সম্ভব।

৪। **প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের সেবা ও রোগ প্রতিরোধ :** প্রজননতন্ত্রে যেকোনো রোগ আক্রমণ করলে তার চিকিৎসা ও প্রতিরোধ করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে আছে সংক্রামক রোগ, প্রজনন অঙ্গের ক্যান্সারসহ সবরকম রোগ, এইডস ইত্যাদি।

কাজ–১ : প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে কী কী সমস্যা হয় তা বাড়ি থেকে লিখে এনে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

ক্রমিক নং	প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় করণীয়সমূহ	না করলে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ
১.		
২.		
৩.		
৪.		
৫.		
৬.		

পাঠ–২ : গর্ভধারণ– মানব শিশু জন্মের পূর্বে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মায়ের গর্ভে থাকে। একে গর্ভধারণ বলে। একটি মায়ের গর্ভে যখন সন্তান আসে, তখন তাকে গর্ভবতী বলে। গর্ভধারণ এর সময় একটি মেয়ের শরীরে বেশ কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সন্তান গর্ভে এলেই শুধু শরীরের এই বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। গর্ভের শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পরে মেয়েদের শরীর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

পরিণত বয়সে গর্ভধারণ : বিয়ের বয়স বলতে মেয়েদের কমপক্ষে ১৮ বছর এবং ছেলেদের কমপক্ষে ২১ বছরকে বোঝায়। তবে ২০ বছর বয়সে গর্ভধারণ হলে গর্ভবতী মায়ের শারীরিক ও মানসিক জটিলতা তেমন দেখা যায় না। এ সময়ে যেসব শারীরিক সমস্যা দেখা যায়, তা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চললে দূর হয়ে যায় এবং যথাসময়ে একটি সুস্থ শিশু জন্ম নেয়।

অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের পরিণতি : একটি মেয়ের অপরিণত বয়সে বিয়ে হলে তার মা হওয়ার মতো শারীরিক পূর্ণতা ও মানসিক পরিপক্বতা থাকে না। কম বয়সে বিয়ে হলে যেসব মেয়েরা মা হয় তারা নানা রকম মানসিক ও শারীরিক জটিলতায় ভোগে। কারণ এ বয়সে মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধি ও গঠন সম্পূর্ণ হয় না। এ ছাড়া অপরিণত বয়সের একটি মেয়ের সন্তানধারণ ও জন্মদান সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণা থাকে না। অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ করলে শুধু যে মেয়েটিই শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা নয়, সদ্যোজাত শিশুর জীবনও ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। এতে ঐ পরিবার মানসিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সমাজেও এর প্রভাব পড়ে।

২০২৩

অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে সৃষ্ট সমস্যা :

১. **স্বাস্থ্যগত সমস্যা–** অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ, শরীরে পানি আসা, প্রচণ্ড মাথাব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখা, জ্বর, খিচুনি, গর্ভপাত ইত্যাদি ঘটে থাকে। ফলে মা ও সন্তানের মৃত্যুঝুঁকি বেড়ে যায়। অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ রোধ করতে পারলে এসব অকাল মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। তাছাড়া এ বয়সে গর্ভবতী হলে সন্তানের বেড়ে উঠার জন্য গর্ভে পর্যাপ্ত জায়গা থাকে না। ফলে কম ওজনের শিশু জন্ম নেয়। অনেক সময় গর্ভে পূর্ণতা লাভের আগেই সন্তানের জন্ম হয় এবং জন্ম থেকেই নানা রকম শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। এসব শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে।

২. **শিক্ষাগত সমস্যা–** মাদরাসায় পড়াকালীন সময়ে কোনো মেয়ের বিয়ে হলে এবং গর্ভধারণ করলে সে লজ্জায় আর মাদরাসায় যায় না। সে মানসিক অশান্তিতে ভোগে। শারীরিক পরিবর্তনের কারণে চলাফেরায় সমস্যা হয় এবং একপর্যায়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়।

৩. **পারিবারিক সমস্যা–** অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে মেয়েরা সুস্থভাবে ঘরের কাজকর্ম করতে পারে না। ঘনঘন অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে।

৪. **আর্থিক সমস্যা–** অপরিণত বয়সের মেয়েরা গর্ভধারণ করলে অনেক বেশি শারীরিক জটিলতায় ভোগে। গর্ভধারণের পুরো সময়টায় ডাক্তারের পরামর্শমতো চলতে হয়। পুষ্টিকর খাবার খেতে হয়। ডাক্তার, ওষুধপত্র ও পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য বেশ অর্থের প্রয়োজন হয়, যা একটি পরিবারকে আর্থিক সমস্যায় ফেলে দেয়।

অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ প্রতিরোধ : বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনে মেয়েদের বিয়ের জন্য বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর, আর ছেলেদের ক্ষেত্রে হবে ২১ বছর। একে পরিণত বয়স ধরা হয়। বিয়ের বয়স হওয়ার আগে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেওয়া হলে তা হবে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। কাজেই আইন মেনে অপরিণত বয়সে ছেলে-মেয়ের বিয়ে না হলে অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের কোনো সুযোগ থাকবে না। অপরিণত বয়সে গর্ভধারণে যেসব জটিলতার সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণার প্রয়োজন। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, নাটক, গান প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। বাল্যবিবাহ বন্ধে সরকারি-বেসরকারি প্রচেষ্টায় সবাইকে সম্পৃক্ত করতে হবে। সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ প্রভৃতির মাধ্যমে অপরিণত বয়সে গর্ভধারণকে নিরুৎসাহিত করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারি-বেসরকারি ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করতে হবে।

কাজ–১ : অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের সমস্যাসমূহ এবং তার সমাধানমূলক প্রতিকার নিচের ছকে লেখ।

সমস্যাসমূহ	সমস্যা সমাধানের উপায়
১।	১।
২।	২।
৩।	৩।
৪।	৪।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বয়ঃসন্ধিকালে জটিল কোনো শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে কার শরণাপন্ন হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত?

ক. মা–বাবা
খ. শিক্ষক
গ. বন্ধু–বান্ধব
ঘ. চিকিৎসক

২. কত বছরের নিচে বাংলাদেশে মেয়েদের গর্ভধারন করা উচিত নয়?

ক. ১৪ বছর
খ. ১৬ বছর
গ. ১৮ বছর
ঘ. ২০ বছর

৩. ছেলে-মেয়েদের দ্রুত শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে কখন?

ক. শিশুকালে
খ. কৈশোরকালে
গ. বয়ঃসন্ধিকালে
ঘ. যৌবনকালে

৪. বয়ঃসন্ধিকালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি?

ক. প্রচুর পরিমাণে ঘুমানো
খ. আমিষ জাতীয় খাবার গ্রহণ
গ. খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকা
ঘ. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা

৫. বয়ঃসন্ধিকালে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন, কেননা এতে–

i. মানুষের প্রতিভার যথাযথ বিকাশ ঘটে
ii. সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান শিশুর জন্মের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়
iii. শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সুস্থ থাকা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও–

৭ম শ্রেণির ছাত্রী বকুলের মা বয়স পরিবর্তন করে বার্ষিক পরীক্ষার পরপরই বকুলকে বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ের কয়েকমাস যেতে না যেতেই বকুলের ঘন ঘন বমি হতে লাগল। খাবারের প্রতি অনীহা বেড়ে গেল। মাঝে মাঝে রক্তক্ষরণ হতে লাগল। ডাক্তারের নিকট নিয়ে গেলে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর ডাক্তার চিন্তিত হয়ে পড়েন।

৬. বকুলের এই অবস্থার কারণ নিচের কোনটি?

ক. আর্থিক অস্বচ্ছলতা
খ. সমাজের দায়িত্বহীনতা
গ. শিক্ষার অপ্রতুলতা
ঘ. অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ

৭. বকুলের মতো মেয়েদের এ অবস্থা থেকে উত্তরণে করণীয়–

i. স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপক প্রচার

ii. প্রচুর ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ

iii. সঠিক বয়সে বিয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　গ. ii ও iii

খ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও–

তাসনিয়া ৮ম শ্রেণির ছাত্রী। সারাদিন সে নিজের ঘরে আনমনা হয়ে বসে থাকে। স্বাভাবিক কাজকর্ম, পড়ালেখা, খাওয়া দাওয়া সবকিছুতেই সে অন্যমনস্ক। তাকে দেখে মনে হয় সে সারাক্ষণ কিছু একটা নিয়ে ভাবছে।

৮. বয়স অনুসারে তাসনিয়া কোনকাল অতিক্রম করছে?

ক. শৈশবকাল　　গ. যৌবনকাল

খ. বাল্যকাল　　ঘ. বয়ঃসন্ধিকাল

৯. এ সময় তাসনিয়া–

i. আবেগ দ্বারা পরিচালিত হতে পারে

ii. পুষ্টিকর খাবারের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে

iii. কোনো বিষয়ের প্রতি কৌতুহলী হয়ে উঠতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　গ. ii ও iii

খ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সুস্থ সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন আবশ্যক– বর্ণনা কর।

২. মা-বাবার সহযোগিতাই পারে সন্তানের বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা সমাধান করতে। মতামত দাও।

৩. অপরিণত বয়সে গর্ভধারণরোধে প্রয়োজন সচেতনতা ও আইনের সঠিক বাস্তবায়ন। মতামত দাও।

৪. নিরাপদ ও উন্নত জীবনের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্যের সুরক্ষা জরুরি– ব্যাখ্যা কর।

৫. বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর কিশোরীরা শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়– বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবনের জন্য খেলাধুলা

খেলাধুলা শরীর ও মনকে সতেজ রাখে। শরীর ও মনের সুস্থতার উপরই নির্ভর করে তার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি। খেলাধুলা শরীর গঠনের এক অন্যতম উৎস। খেলাধুলার মধ্যেই মানুষ খুঁজে পায় জীবন বিকাশের পথ, পায় জীবন সংগ্রামের দৃঢ় মনোবল। সব খেলাতেই জয়-পরাজয় থাকে। খেলাধুলা মানুষের মধ্যে জয় পরাজয় মেনে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করে। জীবনকে পরিচ্ছন্ন, গতিময় ও সাবলীল করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে খেলাধুলা। খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক গুণাবলি অর্জন করে এবং নিজেকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলে।

বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- দেশের খেলাধুলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত অসুবিধা বর্ণনা করে এসব দূরীকরণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, হকি, অ্যাথলেটিকস ও সাঁতারের নিয়মকানুন বর্ণনা করতে পারব;
- ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, হকি, অ্যাথলেটিকস ও সাঁতারের নিয়মকানুন মেনে অনুশীলন করতে পারব;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আগ্রহ অনুযায়ী কমপক্ষে একটি খেলায় বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ করে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারব।

পাঠ–১ : খেলাধুলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত সুবিধা : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব অনেকাংশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তায়। বর্তমানে শরীরিক শিক্ষাকে শিশুর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও সামাজিকীকরণের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়। তাই বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদরাসাগুলোতে শরীরিক শিক্ষা বিষয়টির সঠিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

শারীরিক শিক্ষার ব্যবহারিক দিক হচ্ছে খেলাধুলা। খেলাধুলার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সুপরিকল্পিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন খুবই জরুরি। বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদরাসার শিক্ষার্থীদের ক্রীড়ায় উৎসাহিত করার জন্য শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন দুইটি ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও বিনোদনমূলক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ বিদ্যালয় ও মাদরাসা বাৎসরিক একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করেই ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাদের ক্রীড়া কার্যক্রম শেষ করে থাকে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদরাসায় অসংখ্য শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই সাঁতার জনে না। সাঁতার না জানার কারণে তারা বিভিন্ন সময়ে দুর্ঘটনায় পড়ে এমনকি মৃত্যুবরণ করে। যদি প্রতিটি বিদ্যালয় ও মাদরাসায় একটি পুকুর বা সুইমিংপুল থাকে তবে শিক্ষার্থীরা সাঁতার শিখে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাবে।

মাদরাসা ও বিদ্যালয়গুলোতে একদিকে রয়েছে সঠিক খেলার মাঠের অভাব তেমনি রয়েছে মানসম্মত ক্রীড়া সামগ্রীর ঘাটতি। অবকাঠামোগত অসুবিধার কারণে খেলাধুলা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে শিক্ষার্থীরা বেড়ে উঠলে ভবিষ্যতে জাতীয় স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হবে। তাই অবকাঠামোগত অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এজন্য স্থানীয়ভাবে স্টেডিয়াম ও সুইমিংপুল নির্মান এবং খেলার মাঠের উন্নয়ন করতে হবে। সেই সাথে মাদরাসা ও বিদ্যালয়গুলোতে মানসম্মত ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

কাজ–১ : নিজ নিজ মাদরাসার প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে লেখ।

কাজ–২ : ক্রীড়াঙ্গানের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে কী কী করা যায় তা পরামর্শ করে লেখ।

আমাদের দেশে বিভিন্ন খেলার প্রচলন রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি খেলার নিয়মকানুন ও অনুশীলনের কলাকৌশল বর্ণনা করা হলো।

পাঠ–২ : ব্যাডমিন্টন

ইতিহাস : ১৮৭০ সালে ভারতের পুনায় প্রথম ব্যাডমিন্টন খেলা শুরু হয়েছিল। জনৈক ইংরেজ সৈনিক কর্তৃক এই খেলা ভারত থেকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ার আগে তেমন জনপ্রিয় ছিল না। বো-ফোটের ডিউক ব্যাডমিন্টন খেলায় খুব আগ্রহী ছিলেন এবং তার গ্রামের নাম ব্যাডমিন্টন থেকে এই নামের উৎপত্তি। এই খেলা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইংল্যান্ডের গ্লুসেস্টার সায়ারে বো-ফোটের ডিউকের নিজ বাড়িতে। ১৯৩৪ সালে International Badminton Federation (I.B.F) ইংল্যান্ডের সিলটেন হামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৬৬ সালে এশিয়ান গেমসে ব্যাডমিন্টন খেলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭১ সালে গঠন করা হয় Bangladesh Badminton Federation (B.B.F)। বাংলাদেশে ব্যাডমিন্টন একটি জনপ্রিয় খেলা। গ্রামে-গঞ্জে সকল বয়সের ছেলেমেয়েরা এই খেলা খেলে থাকে।

আইনকানুন :

১. **খেলার কোর্ট–** ব্যাডমিন্টন খেলার কোর্ট দুই ধরনের হয়ে থাকে, একক ও দ্বৈত।

২. **একক কোর্ট–** দৈর্ঘ্য ৪৪ ফুট এবং প্রস্থ ১৭ ফুট।

৩. **দ্বৈত কোর্ট–** দৈর্ঘ্য ৪৪ ফুট এবং প্রস্থ ২০ ফুট।

৪. **কোর্টের দাগ–** সকল দাগের রং হলুদ বা সাদা হবে।

৫. **পোস্ট–** সমতল একটি কোর্টের মেঝে থেকে খুঁটি দুটির উচ্চতা ৫ ফুট ১ ইঞ্চি হবে। এই পোস্ট পার্শ্ব রেখার উপরে অথবা তা থেকে একটু দূরে মাটিতে পুঁতলেও চলবে।

৬. **নেট–** খুঁটির কাছে মেঝে থেকে নেটের উপরিভাগের উচ্চতা হবে ৫ ফুট ১ ইঞ্চি। নেটটি ২$\frac{১}{২}$ ফুট চওড়া থাকবে।

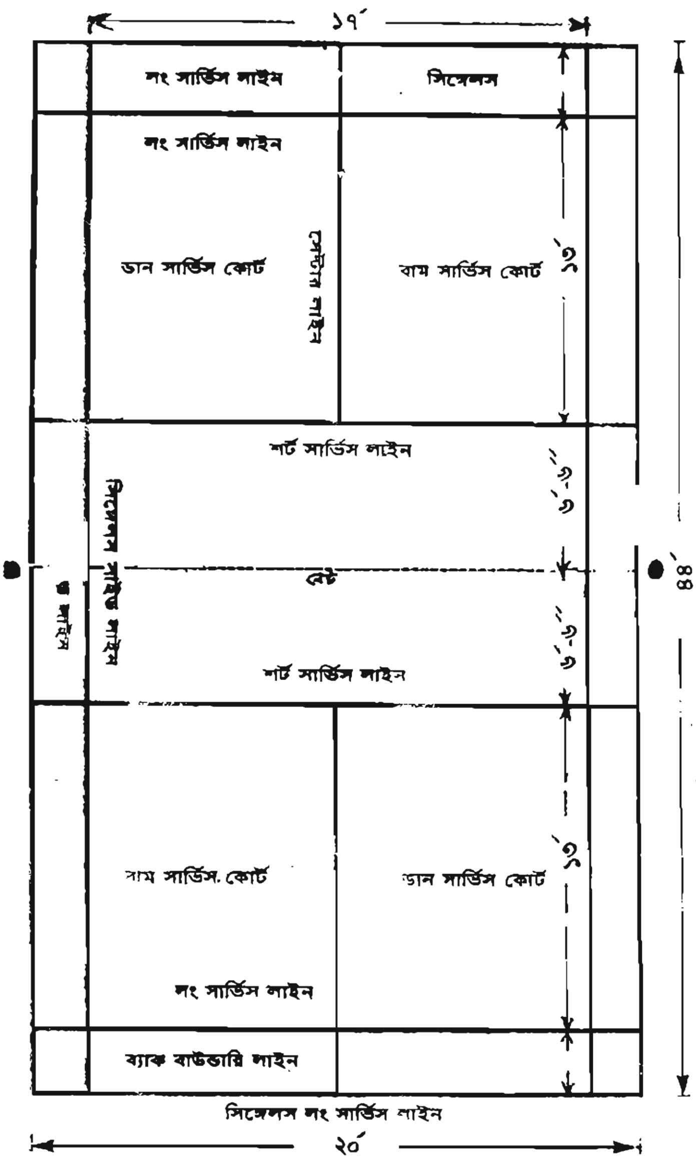

ব্যাডমিন্টন খেলার কোর্ট

৭. **শাটল–** খেলার জন্য একটি শাটল কক থাকবে।

৮. **একক খেলা–** যে খেলায় প্রতিপক্ষে একজন করে খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে, তাকে একক খেলা বলে।

৯. **দ্বৈত খেলা–** যে খেলায় প্রতিপক্ষে দুজন করে খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে, তাকে দ্বৈত খেলা বলে।

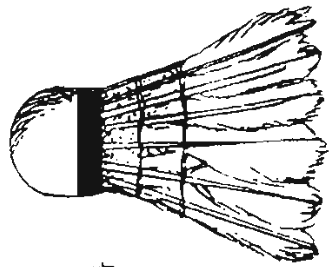

শাটল কক

১০. **টস–** টস বিজয়ী প্রথম সার্ভিস করবে বা প্রথম রিসিভ করবে। বিপক্ষ খেলোয়াড় কোর্টের বাম দিক পছন্দ করবে।

১১. **বিচারক–** খেলা পরিচালনার জন্য ১ জন রেফারি, ১ জন আম্পায়ার, ১ জন স্কোরার, ২ জন অথবা ৪ জন লাইন জাজ থাকবেন।

১২. **গেম–** একক ও দ্বৈত উভয় খেলায় ২১ পয়েন্টে গেম হয়। উভয় খেলোয়াড় বা দল ২০-২০ পয়েন্ট অর্জন করলে সেক্ষেত্রে ২ পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে থেকে জয়লাভ করতে হবে, অর্থাৎ ২২-২০, ২৫-২৩ পয়েন্টে। উভয় দলের পয়েন্ট সমান হওয়াকে ডিউস বলে। মনে রাখতে হবে, এভাবে সর্বোচ্চ ৩০ পয়েন্টের মধ্যে অবশ্যই গেম শেষ করতে হবে। চূড়ান্ত সেটে ১১ পয়েন্ট হলে সাইড পরিবর্তন হয়। তিনটি গেমের মধ্যে যে বা যে দল দুই খেলায় জিতবে, সে বা সেই দল বিজয়ী হবে।

১৩. একক খেলার সময় সার্ভিসকারীর পয়েন্ট শূন্য বা জোড় সংখ্যা হলে খেলোয়াড় তাদের ডান দিকের কোর্ট থেকে সার্ভিস করবে এবং বিজোড় সংখ্যা হলে বাম দিকের কোর্ট থেকে সার্ভিস করবে। প্রতি পয়েন্টের পর খেলোয়াড়গণ তাদের সার্ভিস বা রিসিভ কোর্ট বদল করবে।

১৪. দ্বৈত খেলার সময় প্রথম সার্ভিসের জন্য ডানদিকের খেলোয়াড় কোনাকুনি বিপক্ষের কোর্টে সার্ভিস করবে। যাকে সার্ভিস করা হবে কেবল সেই খেলোয়াড় সার্ভিস গ্রহণ করবে। কোনো খেলোয়াড় পরপর দুইবার সার্ভিস করতে পারবে না। প্রথম গেমে বিজয়ী খেলোয়াড় দ্বিতীয় গেমে সার্ভিস শুরু করবে।

১৫. সার্ভিসের সময় সার্ভারের দুই পা মাটি স্পর্শ করে থাকবে।

১৬. সার্ভিস করার সময় শাটল নেটে লেগেও যদি ঠিক কোর্টে পড়ে তবে সার্ভিস ঠিক হয়েছে বলে ধরা হবে।

১৭. শাটল দাগ স্পর্শ করলেই সার্ভিস ঠিক হয়েছে বলে ধরা হবে।

১৮. নেট অতিক্রম করে কেউ শাটলে আঘাত করতে পারবে না এবং খেলা চলাকালে কেউ র‍্যাকেট বা শরীরের কোনো অংশ দিয়ে নেট ও পোস্ট স্পর্শ করতে পারবে না।

কলাকৌশল : ব্যাডমিন্টন খেলা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হলে প্রয়োজন হাত ও কব্জির নমনীয়তা এবং পায়ের কাজ। ব্যাডমিন্টন খেলার মৌলিক কলাকৌশল হলো-

১. র‍্যাকেট ধরা (Gripping)
২. পায়ের কাজ (Foot Work)
৩. সার্ভিস (Service)
৪. ফোরহ্যান্ড স্ট্রোক (Forehand Stroke)
৫. ব্যাকহ্যান্ড স্ট্রোক (Backhand Stroke)
৬. মাথার উপর দিয়ে মারা (Overhead Stroke)
৭. নেটের কাছে মারা (Net Stroke)

১. র‍্যাকেট ধরা (Gripping) : র‍্যাকেট সঠিকভাবে ধরার উপরই ব্যাডমিন্টন খেলা অনেকটা নির্ভর করে। এবার ডান হাতের তালু উপুড় করে গ্রিপের শেষ প্রান্তে রেখে বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জনী সামনের দিকে প্রসারিত করে ইংরেজি 'V' বর্ণের মতো করে গ্রিপ ধরবে। ভালো গ্রিপ ধরা আয়ত্তে এলে ভালো খেলতে সাহায্য করবে।

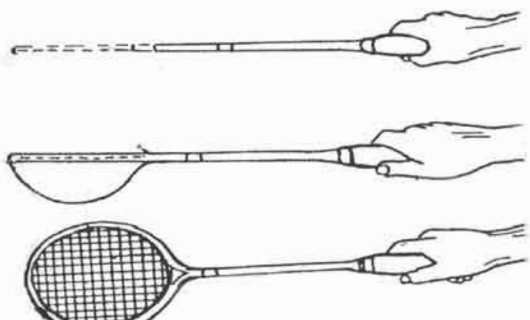

র‍্যাকেট ধরা

২. পায়ের কাজ (Foot Work) : ব্যাডমিন্টন খুব দ্রুতগতির খেলা। তাই পায়ের কাজ খুব দ্রুত হয়ে থাকে। কাজেই বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খুব দ্রুত গতিতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ ব্যাপারে পায়ের কাজটা সবচেয়ে বেশি। দ্রুত গতির খেলায় ফুটওয়ার্ক ভালো না হলে শাটল কক সঠিকভাবে সঠিক স্থানে পাঠানো বা ফেরানো যায় না। ভালো ফুটওয়ার্ক আয়ত্ত করতে পারলেই দ্রুততার সাথে শাটল ককের কাছে পৌঁছতে পারে এবং পছন্দমতো কোর্টে শাটল কক ফেরত পাঠাতে পারে।

৩. সার্ভিস (Service) : একজন খেলোয়াড় নিয়ম-কানুন মেনে খেলার শুরুতে এবং প্রতি পয়েন্টের শুরুতে প্রতিপক্ষের কোর্টে শাটল কক পাঠানোকে সার্ভিস বলে। সার্ভিসটি বিপক্ষ কোর্টের এমন জায়গায় পাঠাতে হবে, যাতে বিপক্ষ খেলোয়াড়দের ফেরত পাঠাতে অসুবিধা হয়। সার্ভিস করার সময় পা ফাঁক করে বাম পা ডান পায়ের কিছুটা সামনে নিয়ে দাঁড়াবে। শরীরের ওজন পিছনের পায়ের উপর থাকবে। বাম হাতে শাটল কক ধরে, ডান হাতের র‍্যাকেটকে পিছনের দিক থেকে আনার মুহূর্তে শাটল কক ছেড়ে দিয়ে কোমরের নিচে

আঘাত করে বিপক্ষ কোর্টে পাঠাবে। শাটল কক ও র‍্যাকেটের সংযোগের সাথে সাথে দেহের ওজন বাম পায়ের

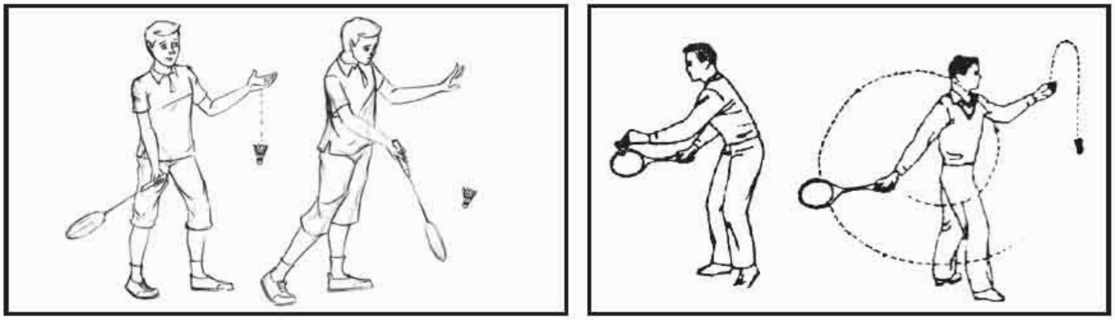

সার্ভিস

উপর চলে আসবে। সার্ভিস দুই প্রকার, শর্ট সার্ভিস ও লং সার্ভিস। শর্ট সার্ভিসে নেটের কাছাকাছি বিপক্ষের সার্ভিস কোর্টে শাটল কক পাঠানো হয় এবং লং সার্ভিসে কোর্টের পিছনের অংশে পাঠানো হয়।

৪. ফোরহ্যান্ড স্ট্রোক (Forehand Stroke) : হাতের তালুকে সামনে রেখে ডানহাতি খেলোয়াড় ডান দিকে এবং বামহাতি খেলোয়াড় বাম দিকে শাটল কক মারলে তাকে ফোরহ্যান্ড স্ট্রোক বলে।

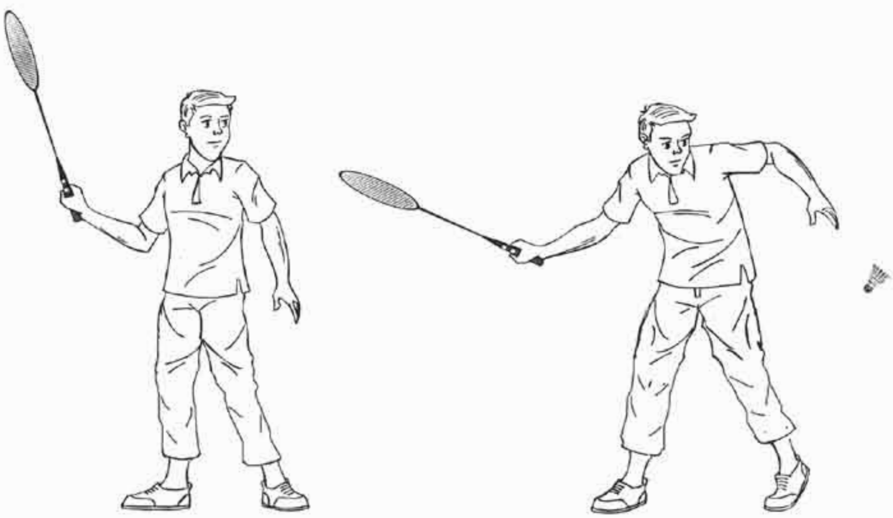

ফোরহ্যান্ড স্ট্রোক

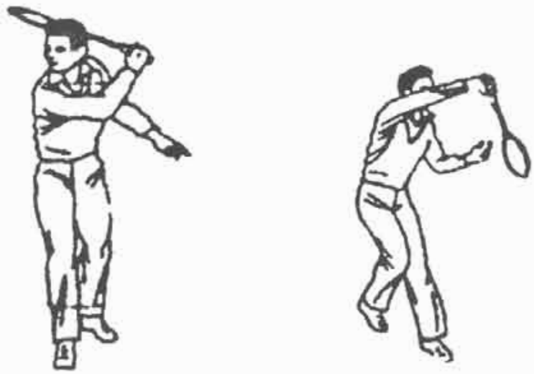

ব্যাকহ্যান্ড স্ট্রোক

৫. ব্যাকহ্যান্ড স্ট্রোক (Backhand Stroke) : সঠিকভাবে র‍্যাকেট ধরে হাতের তালু পিছনের দিকে করে ডান হাতি খেলোখাড়ের ডান কাঁধ এবং বাম হাতি খেলোয়াড়ের বাম কাঁধ নেটের দিকে রেখে শাটল কক মারলে তাকে ব্যাকহ্যান্ড স্ট্রোক বলে।

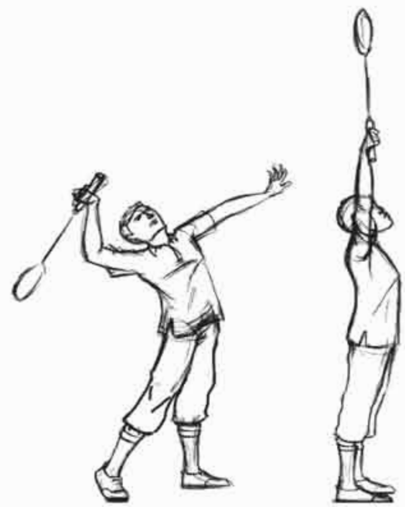

মাথার উপর দিয়ে মারা

৬. মাথার উপর দিয়ে মারা (Overhead Stroke) : সাধারণত 'স্ম্যাশ' বা চাপ মারার কাজে এই স্ট্রোক ব্যবহার করা হয়। এই স্ট্রোকে 'ফোর হ্যান্ড' ও 'ব্যাক হ্যান্ড' দুটোই ব্যবহার করা যেতে পারে। শাটল ককের নিচে এসে র‍্যাকেট উঁচু করে লাফ দিয়ে যতটুকু উঁচুতে সম্ভব শাটল কককে আঘাত করবে।

৭. নেটের কাছে মারা (Net Stroke) : শাটল কক যখন নেটের খুব কাছাকাছি পড়ে, তখন এই স্ট্রোকের সাহায্যেই শাটল কককে মারতে হয়। এই স্ট্রোকের ব্যবহারের জন্য হাতের সুক্ষ্মতার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ হাতের উপর দখল থাকলে শাটল কক নেটের খুব কাছে ফেলা সম্ভব হয়। এর জন্য প্রচুর অনুশীলনের প্রয়োজন।

নেট স্ট্রোক

কাজ–১ : ব্যাডমিন্টন খেলায় র‍্যাকেট ধরার কৌশল প্রদর্শন কর।
কাজ–২ : ব্যাডমিন্টন খেলায় সার্ভিস করার কৌশল প্রদর্শন কর।

পাঠ–৩ বাস্কেটবল

ইতিহাস – বাস্কেটবল খেলার প্রথম প্রচলন হয় ১৮৮১ সালে আমেরিকায়। এ খেলার জনক হলেন আমেরিকার স্প্রিং ফিল্ডে ওয়াই.এম.সি.এ কলেজের শারীরিক শিক্ষার পরিচালক ড. জেমস নেইসমিথ। ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক খেলা হিসাবে বাস্কেটবল অন্তর্ভুক্ত হয়। আমেরিকার জাতীয় খেলা বাস্কেটবল। পৃথিবীর বহু দেশে এখন বাস্কেটবল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই উপমহাদেশে প্রথম বাস্কেটবল খেলা শুরু হয় কলকাতার ওয়াই.এম.সি.এ কলেজে ড. জন হেনরি গ্রের উদ্যোগে। বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলগুলোতে প্রথম বাস্কেটবল খেলা শুরু হয়। বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের উদ্যোগে বর্তমানে দেশে আন্তঃক্লাব ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এ ছাড়া আন্তঃস্কুল, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়, আন্তঃক্যাডেট কলেজ পর্যায়ে বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা হয়।

আইনকানুন :

১. কোর্ট- বাস্কেটবল কোর্টের দৈর্ঘ্য ২৮.৬৫ মি এবং প্রস্থ ১৫.২৪ মি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের জন্য দৈর্ঘ্য হবে ৮৪ ফুট (২৫.৬২ মি)। দাগগুলো একই রঙের হবে। বোর্ড যদি স্বচ্ছ কাচের হয় তাহলে রেখা হবে সাদা, অন্য ক্ষেত্রে হবে কালো। দাগ চওড়া হবে ৫ সেন্টিমিটার।

২. মধ্যবৃত্ত - মধ্যবৃত্ত ও সংরক্ষিত এলাকার বৃত্ত দুটির মাপ একই হবে। বৃত্তগুলোর ব্যাসার্ধ হবে ১.৮৩ মি। খেলা শুরু হওয়ার সময় দুই পক্ষের দুজন খেলোয়াড় মধ্যবৃত্তের মধ্যে অবস্থান করবে এবং অন্যান্য খেলোয়াড়রা বৃত্তের বাইরে থাকবে। বৃত্তের মধ্য থেকে জাম্প বলের মাধ্যমে বাস্কেটবল খেলা শুরু করতে হয়।

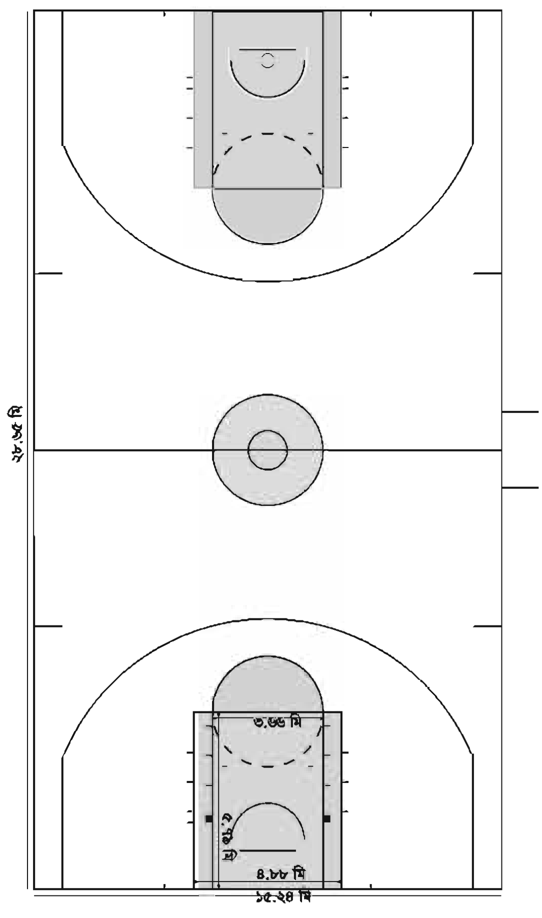

বাস্কেট বল খেলার কোর্ট

৩. **রিং**- কোর্ট থেকে রিংয়ের উচ্চতা ৩.০৫ মি। রিংয়ের কেন্দ্রবিন্দু থেকে ৬.২৫ মি ব্যাসার্ধের বৃত্তচাপ অঙ্কন করতে হবে।

৪. **বল**- আকৃতি গোলাকার হবে। বলটি সিনথেটিক রাবারের দ্বারা তৈরি হবে। বলের রং হবে কমলা।

৫. **ফাউল ও ভায়োলেশন**- কোনো খেলোয়াড়ের সাথে বিপক্ষ দলের কোনো খেলোয়াড়ের ইচ্ছাকৃত সংঘর্ষ ঘটলে তাকে ফাউল বলে। আর ভায়োলেশন হচ্ছে আইন অমান্য করা অর্থাৎ খেলার বিবিধ নিয়ম ভঙ্গা করাকেই ভায়োলেশন বলে।

ফাউল

ক. বিপক্ষকে ধরলে, ধাক্কা মারলে বা দুই হাত দিয়ে বিপক্ষের অগ্রগতিতে বাধা দিলে এবং আঘাত করলে।

খ. বল ড্রপ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় বিপক্ষের কাউকে জোর করে সরিয়ে দিলে।

গ. যার হাতে বল নেই তার গায়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ধাক্কা দিলে।

ঘ. বিপক্ষ খেলোয়াড় বা আম্পায়ারের সাথে কোনোরূপ অসদাচরণ করলে।

ভায়োলেশন

১. বিনা ড্রিবলিংয়ে বল নিয়ে দুই স্টেপের বেশি হাঁটলে বা দৌড়ালে;

২. বল হাতে করে দুই পা এদিক-সেদিক নড়াচড়া করলে;

৩. দুই হাত দিয়ে বল ড্রিবলিং করলে;

৪. নিজ দলের আয়ত্তে বল থাকার সময় বিপক্ষ দলের সংরক্ষিত এলাকার ভিতর তিন সেকেন্ডের বেশি অবস্থান করলে;

৫. পাঁচ সেকেন্ডের বেশি বলকে ধরে রাখলে (যদি বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় নিকট থেকে প্রতিরোধ করে);

৬. নিজ অর্ধের মধ্যে থেকে বিপক্ষ দলের অর্ধেক মাঠে ৮ সেকেন্ডের মধ্যে বল নিয়ে প্রবেশ না করলে।

৬. **অফিসিয়াল**– ১ জন রেফারি, ১ জন আম্পায়ার, ১ জন স্কোরার, ১ জন সহকারী স্কোরার, ১ জন টাইম কিপার, ১ জন ২৪ সেকেন্ড অপারেটর।

৭. **সময়কাল**– প্রতি কোয়ার্টার দশ মিনিট করে মোট চার কোয়ার্টার খেলা হবে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শেষ এবং তৃতীয় কোয়ার্টার শুরুর পূর্বে দশ মিনিট বিরতি থাকবে। এ ছাড়া প্রত্যেক কোয়ার্টারের মধ্যে ২ মিনিট বিরতি থাকবে।

৮. **স্কোরিং পয়েন্ট**– খেলা চলাকালীন কোনো খেলোয়াড় বৃত্তচাপের বাইরে থেকে স্কোর করলে ৩ পয়েন্ট, বৃত্তচাপের ভিতর থেকে স্কোর করলে ২ পয়েন্ট এবং একটি ফ্রি থ্রো থেকে স্কোর করলে ১ পয়েন্ট হয়।

৯. **খেলোয়াড়**– বাস্কেটবল খেলা দুটি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি দলে ১২ জন খেলোয়াড় থাকে। কিন্তু খেলায় অংশগ্রহণ করে একসাথে ৫ জন। বাকী ৭ জন অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসাবে থাকে।

১০. **টাইম আউট–** একটি দল প্রথম দুই কোয়ার্টারে ১ বার করে ২ বার, তৃতীয় এবং চতুর্থ কোয়ার্টারে ৩ বার এবং প্রতিটি অতিরিক্ত পর্যায়ে ১ বার টাইম আউট নিতে পারেন। টাইম আউটের সময় ১ মিনিট।

১১. **খেলার নিষ্পত্তি–** নির্ধারিত সময়ে যদি উভয় দলের পয়েন্ট সমান হয়, তাহলে আরও অতিরিক্ত ৫ মিনিট খেলা হবে। তাতেও যদি মীমাংসা না হয়, তাহলে এভাবে ৫ মিনিট করে খেলা চলতে থাকবে যতক্ষণ খেলা মীমাংসা না হয়।

কলাকৌশল

বাস্কেটবল খেলতে হলে দরকার দম, দৌড়াবার ও জাম্প দেওয়ার ক্ষমতা এবং সেই সাথে শরীরের ক্ষিপ্রতা। বাস্কেটবল খেলার মৌলিক কলাকৌশলগুলো হলো- দাঁড়াবার ভঙ্গি, বল ধরা, ড্রিবলিং করা, বল দেওয়া বা পাস করা, বল ছোড়া বা বাস্কেট করা, বিপক্ষকে পাহারা দেওয়া ইত্যাদি।

১. **দাঁড়াবার ভঙ্গি (Stance)** - বল নিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গিটি খেলার সময় বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। খেলার মধ্যে অনেক সময় বল নিয়ে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়তে হয়, সফল আক্রমণ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য। সঠিকভাবে দাঁড়াবার জন্য সব সময় পা দুটোকে ছড়িয়ে বা ফাঁক করে হাঁটু সামান্য ভেঙে দাঁড়াতে হবে।

২. **বল ধরা (Catching)-** বল এমনভাবে ধরতে হবে যাতে বলটা দখলে থাকে। বল ধরার সময় আঙ্গুলগুলোকে ছড়িয়ে দিয়ে বুড়ো আঙ্গুলগুলো দিয়ে বলকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। হাতের তালু দিয়ে বল ধরা ঠিক নয়।

বল ধরা

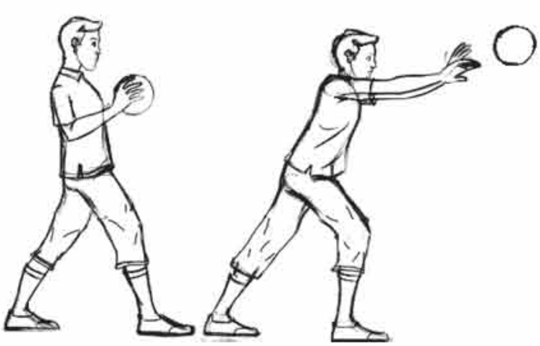

বল পাসিং

৩. **বল পাস দেওয়া(Passing)-** বল পাস দেওয়ার সময় মনে রাখতে হবে যে এ সময় কব্জি ও কনুই শরীরের অন্যান্য অংশ থেকে অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং বল দেওয়ার সময় সাধারণত একটা পা সামনে ও আরেকটা পা পিছনে থাকে। বাস্কেটবল পাস দেওয়া হয় সাধারণত চেস্ট পাস, আন্ডারহ্যান্ড পাস, বাউন্স পাস, ওভারহেড পাস ইত্যাদি। সব ধরনের পাস শেখা দরকার। তবে চেস্ট পাস সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৪. ড্রিবলিং (Dribbling) -ড্রিবলিং এর সময় বলকে আঙ্গুলগুলো দিয়ে ঠেলা দিতে হয়। ড্রিবলিংয়ের সময় হাতের আঙ্গুলগুলোকে বলের উপর বেশ খানিকটা ছড়িয়ে রাখতে হয়। আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে রাখলে বলটির অনেক অংশের উপরই নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়। হাতের কব্জি ও আঙ্গুলগুলোর নিখুঁত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে বলকে মাটিতে ঠেলে দিলেই বল লাফিয়ে উপরে উঠে, তখন বল ধরা ও সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়।

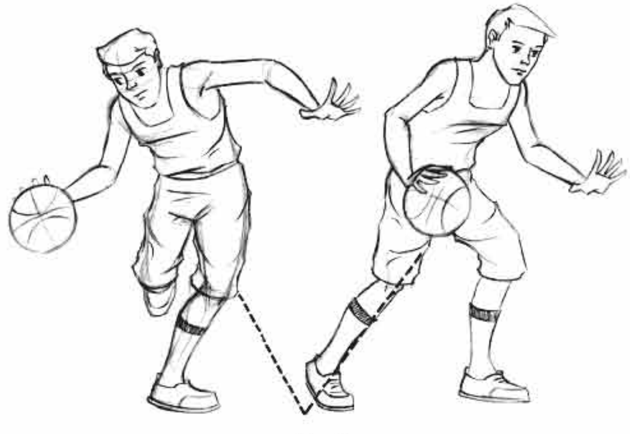

ড্রিবলিং

ড্রিবলিং করার সময় শরীরটাকে এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে যেকোনো সময় যেকোনো দিকে সহজেই অগ্রসর হওয়া যায়। মাথা সব সময় উঁচু ও সোজা থাকবে। ড্রিবলিংয়ের সময় দৃষ্টি সব সময় সামনের দিকে রাখতে হবে, যাতে নিজের দল ও বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে দেখা যায়।

৫. পায়ের উপর ঘোরা (Pivoting) : যখন খেলোয়াড় বল নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে, একটা পা একই জায়গায় রেখে অন্য পা-টিকে যেকোনো দিকে যতবার ইচ্ছা ঘুরিয়ে নেয়, তখন তাকে 'পিভটিং' বলে।

পিভটিং

৬. বাস্কেটে বল ছোড়া (Shooting) : বল সরাসরি বাস্কেটের মধ্যে শুট করা যায়। আবার প্রথমে বোর্ডে সোজাসুজিভাবে লাগিয়ে রিংয়ের মধ্যে বল ঢুকানো যায়। শুটিংয়ের বিভিন্ন কৌশল নিম্নরূপ-

সেট শুট

ক. সেট শুট– এক জায়গায় দাঁড়ানো অবস্থায় যে শুট করা হয়, তাকে সেট শুট বলে। এক হাতে বা দুহাতে এই শুট করা যায়। এক হাত দিয়ে শুট করার সময় যে হাত দিয়ে শুট করা হয়, সে হাত বলের পিছনে থাকে এবং অন্য হাত বলের পাশে থাকে। শুটিংয়ের সময় পাশের হাত সরিয়ে নিচের হাত দিয়ে বলে ধাক্কা দিতে হয়। দুই হাতে শুটিংয়ের সময় উভয় হাত বলের পিছনে থাকবে এবং উভয় হাত দিয়েই বল ঠেলে দিতে হবে। সাধারণত ৪ থেকে ৮ মিটার দূর থেকে গোল করার জন্য সেট শুট ব্যবহার করা হয়।

খ. লে–আপ শুট– কাছ থেকে গোল করার জন্য সাধারণত এ শুট নেওয়া হয়। এতে খেলোয়াড়রা ড্রিবলিং করতে করতে সামনে এগিয়ে যায়। এক পা দিয়ে জোরে মেঝেতে আঘাত করে শরীর উঁচুতে তোলে। যে হাত দিয়ে বল মারবে সে হাত সোজা করে বল সরাসরি বাস্কেটে বা বোর্ডে আঘাত করে ফেলতে হয়।

লে-আপ শুট

কাজ–১ : বাস্কেটবল খেলায় ড্রিবলিং কীভাবে করতে হয় তা করে দেখাও।

কাজ–২ : লে-আপ শুটের কৌশল প্রদর্শন কর।

কাজ–৩ : চেস্ট পাসের কৌশলগুলো করে দেখাও।

২০১৯

পাঠ–৪ : হ্যান্ডবল

ইতিহাস– বিশেষজ্ঞদের মতে, হ্যান্ডবল খেলার উৎপত্তি হয়েছে জার্মানিতে ১৮৯০ সালে। ১৯৪৬ সালে ইন্টারন্যাশনাল হ্যান্ডবল ফেডারেশন (IHF) গঠিত হয়। ১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিকে পুরুষ এবং ১৯৭৬ সালে মন্ট্রিল অলিম্পিকে মহিলা হ্যান্ডবল প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়। এশিয়ান হ্যান্ডবল ফেডারেশন (AHF) গঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। হ্যান্ডবল খেলা ১৯৮২ সালের এশিয়ান গেমসে প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৮৫ সালে নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন (BHF) গঠন করা হয়। বর্তমানে এই খেলা বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

আইনকানুন :

১. হ্যান্ডবল মাঠের দৈর্ঘ্য ৪০ মি এবং প্রস্থ ২০ মি। দৈর্ঘ্যের লাইনকে সাইড লাইন বা পার্শ্বরেখা এবং প্রস্থের লাইনকে প্রান্তরেখা বা গোললাইন বলে।

২. প্রতিটি গোলপোস্ট দৈর্ঘ্যে ৩ মিটার। উচ্চতা ভূমি হতে ক্রসবারের নিচ পর্যন্ত ২ মিটার।

৩. গোলপোস্টের সম্মুখ বরাবর মাঠের দিকে ৬ মিটার দূরে গোললাইনের সমান্তরাল ৩ মিটার লম্বা একটি লাইন টানতে হবে। গোলপোস্টের কোনা থেকে ৬ মিটার ব্যাসার্ধের দুটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করে গোল লাইনের সাথে যুক্ত করলে গোলসীমা তৈরি হবে। অঙ্কিত লাইনটিকে গোল এরিয়া লাইন বলে। মাঠের সকল দাগ খেলার মাঠের অংশ বলে বিবেচিত হবে।

৪. ফ্রি থ্রো লাইন লম্বা দাগ দিয়ে (----) ফাঁকা ফাঁকা করে অঙ্কন করতে হবে। লাইনটি গোল এরিয়া লাইনের সমান্তরালে ৩ মিটার বাইরে হবে।

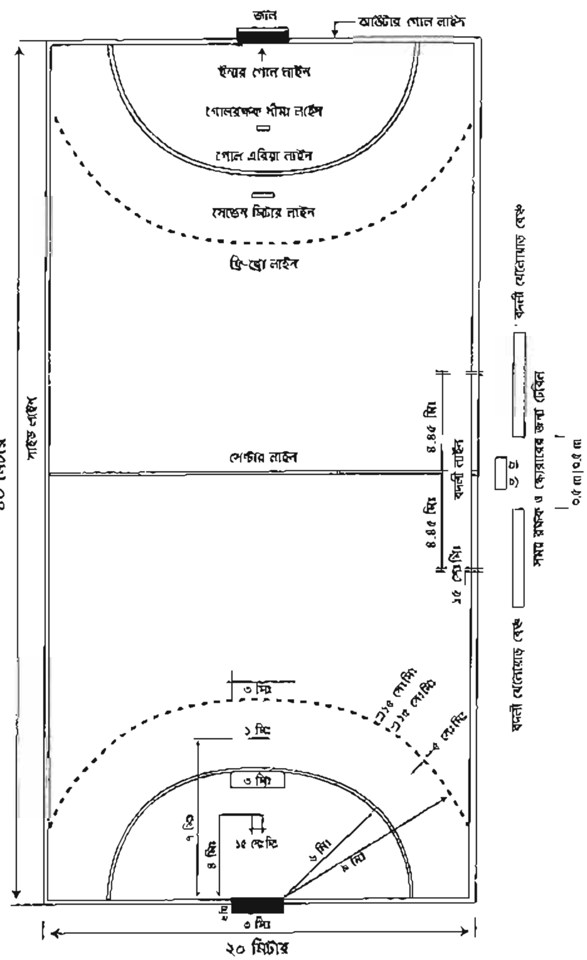

হ্যান্ডবল মাঠ

৫. প্রতিটি গোললাইনের পিছনের অংশের ঠিক মধ্যবিন্দু হতে মাঠের দিকে ৭ মিটার দূরে গোললাইনের সমান্তরালে ১ মিটার লম্বা একটি সেভেন মিটার লাইন (পেনাল্টি থ্রো লাইন) টানতে হবে।

৬. প্রতিটি গোললাইনের পিছনের অংশের ঠিক মধ্যবিন্দু হতে মাঠের দিকে ৪ মিটার দূরে গোললাইনের সমান্তরালে একটি গোলরক্ষক সীমা লাইন টানতে হবে।

৭. মাঠের দুই পার্শ্বরেখা থেকে পরস্পর যুক্ত করে মধ্যরেখা টানতে হবে। উভয় দিকে বদলি লাইন থাকবে। দলের সুবিধার্থে মাঠের খেলোয়াড়রা বদলি লাইনে বসে থাকবে।

৮. খেলার সময়সীমা হবে ২৫ মিনিট + ১০ মিনিট (বিরতি) + ২৫ মিনিট।

৯. নির্ধারিত সময়ে খেলা অমীমাংসিত থাকলে অতিরিক্ত ৫ মিনিট করে অর্থাৎ ৫ মিনিট + ১ মিনিট (বিরতি) + ৫ মিনিট খেলা হবে। এরপরও যদি ড্র থাকে, তাহলে আবার ৫ মিনিট + ১ মিনিট (বিরতি) + ৫ মিনিট খেলা চলবে।

১০. প্রত্যেক দলে ১২ জন খেলোয়াড় থাকে। মাঠে খেলতে নামে ৭ জন। কমপক্ষে ৫ জন খেলোয়াড় না হলে খেলা হয় না।

১১. খেলা আরম্ভের সময় বা গোল হওয়ার পর বা বিরতির পর থ্রো অফের মাধ্যমে খেলা শুরু হবে।

১২. খেলা পরিচালনার জন্য ২ জন রেফারি, ১ জন স্কোরার ও ১ জন সময়রক্ষক থাকবেন।

১৩. খেলোয়াড়রা বাহু, মাথা, দেহ, উরু ও হাঁটু দিয়ে বলকে ধরতে, থামাতে বা আঘাত করতে পারবে। বল ৩ সেকেন্ডের বেশি ধরে রাখতে বা ৩ পদক্ষেপের বেশি এগুতে পারবে না। হাঁটুর নিচের অংশ দিয়ে বল স্পর্শ করলে শাস্তিস্বরূপ বিপক্ষ দল ফ্রি থ্রো পাবে।

১৪. গোলরক্ষকের হাতে বল লেগে বা গোললাইন দিয়ে বল মাঠের বাইরে গেলে কর্ণার থ্রো-এর মাধ্যমে খেলা শুরু হবে।

১৫. বিপক্ষ দলকে ফ্রি থ্রো দেওয়া হবে-

ক. গোলরক্ষক নিয়মভঙ্গা করলে ;

খ. ত্রুটিপূর্ণভাবে খেলোয়াড় বদলি করলে ;

গ. মাঠের খেলোয়াড় গোলসীমা আইন ভঙ্গা করলে ;

ঘ. প্রতিপক্ষের প্রতি অবৈধ আচরণ করলে ;

ঙ. ত্রুটিপূর্ণ থ্রো-ইন করলে ;

চ. যেকোনো থ্রো করতে ভুল করলে ;

ছ. ত্রুটিপূর্ণ থ্রো-অফ করলে ;

জ. অখেলোয়াড়োচিত আচরণ করলে ;

ঝ. গোলরক্ষক গোলসীমার বাইরের বল নিয়ে গোলসীমায় প্রবেশ করলে ;

ঞ. গোলরক্ষকের কাছে গোলসীমায় ব্যাকপাস করলে।

১৬. বিপক্ষ দল পেনাল্টি থ্রো পাবে–

ক. মাঠের যেকোনো স্থানে কোনো খেলোয়াড় বা কর্মকর্তা আক্রমণকারী দলের একটি সম্ভাব্য গোলের সুযোগ অবৈধভাবে নষ্ট করে দিলে।

খ. একটি নিশ্চিত গোল করার সময় যদি কোনো অবৈধ বাঁশির সংকেতে তা নষ্ট হয়ে যায়।

গ. মাঠে প্রবেশের অনুমতি নেই এমন কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কারণে যদি একটি নিশ্চিত গোলের সুযোগ নষ্ট হয়।

১৭. বল পার্শ্বরেখা অতিক্রম করলে থ্রো ইনের মাধ্যমে খেলা শুরু হবে।

১৮. গোলরক্ষক তার গোল এরিয়ার মধ্যে শরীরের যেকোনো অংশ দিয়ে খেলতে পারবে।

১৯. সম্পূর্ণভাবে বলটি গোলের ভিতরের লাইন অতিক্রম করলে গোল হয়েছে বলে গণ্য হবে। যে দল বেশি গোল করবে সেই দল বিজয়ী হবে।

কলাকৌশল : হ্যান্ডবল ও বাস্কেটবলের কলাকৌশল প্রায় একই। তবে হ্যান্ডবলে কতকগুলো বাড়তি সুযোগ পাওয়া যায়। কারণ হ্যান্ডবলে যে বল ব্যবহার করা হয়, তা বাস্কেট বলের চেয়ে ওজনে হালকা ও আকারে ছোট। তাছাড়া হ্যান্ডবলের নিয়মকানুন বাস্কেটবল থেকে অনেকটা সহজ ও সরল।

১. **বল ধরা :** হ্যান্ডবল খেলায় বলটাকে বিভিন্নভাবে ধরা যেতে পারে- ক. সম্মুখের বল ধরা খ. পার্শ্বের বল ধরা গ. কোমরের নিচের বল ধরা ঘ. মাথার উপরে বল ধরা ঙ. লাফিয়ে বল ধরা চ. মাটিতে গড়ানো বল ধরা। পরিস্থিতি অনুযায়ী উপরের যেকোনো নিয়মে এক বা দুই হাতে বল ধরা যায়। বল

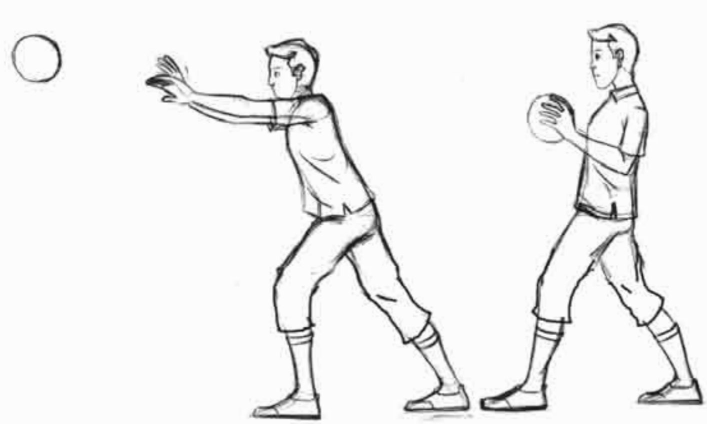

সম্মুখের বল ধরা

হাতে ধরার সময় হাতের আঙ্গুল ছড়িয়ে দিয়ে বলের উপর দৃষ্টি রেখে, কনুই ভেঙে বলটিকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে আয়ত্ত করতে হয়।

২. **বল পাস দেওয়া :** নিজের দলের খেলোয়াড়কে বল পাস দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। যেহেতু হ্যান্ডবলের ওজন অনেকটা হাল্কা ও ছোট, সেহেতু হ্যান্ডবলকে এক হাতে ছুঁড়ে পাস দেওয়া অনেক সুবিধাজনক। তবে পরিস্থিতি অনুসারে দুই হাতেও পাস দেওয়া যেতে পারে। এক হাতে ছুঁড়ে পাস দেওয়ার সময় বলটাকে সাধারণত ডান হাত দিয়ে ঠিকভাবে ধরে কাঁধের লাইনের পিছনে হাতটাকে নিয়ে বাম পায়ের উপর ভর রেখে ছুড়তে হয়। বাম হাতটাকে সামনে রেখে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। বল পাস দেওয়াটা বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন: কাঁধ বরাবর, কব্জি ঘুরিয়ে, হাত কোমরের নিচে এনে ও মাথার উপর দিয়ে পাস দেওয়া ইত্যাদি।

বল ছোড়া

৩. **গোলপোস্টে বল ছোঁড়া :** হ্যান্ডবলে গোল করতে হলে বল ছুঁড়ে মারাটাকে ভালোভাবে রপ্ত করতে হবে। কারণ একটি নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে থেকেই গোল করতে হয়। বল ছুঁড়ে গোল করাটা বেশ কঠিন ব্যাপার। কারণ গোল পোস্টের আকার বেশ ছোট। তবে হ্যান্ডবল খেলতে গেলে চটপটে হতে হবে। সেই সাথে গতিবেগ, ক্ষিপ্রতা, নমনীয়তা অবশ্যই থাকতে হবে। বলকে বিভিন্নভাবে ছুঁড়ে গোল করা যায়। যেমন, সরাসরি ছুঁড়ে মারা, পাস দিয়ে ছুঁড়ে মারা, লাফিয়ে মারা, বলকে মাটিতে মেরে উঠানো ইত্যাদি।

৪. **বল কাটিয়ে নিয়ে যাওয়া :** হ্যান্ডবলকে হাতে করে তিন স্টেপের বেশি নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাই আয়ত্তে রাখতে হলে বলকে অবশ্যই মাটিতে ড্রপ দিয়ে তুলতে হবে অর্থাৎ বাউন্স করাতে হবে। এভাবে যতক্ষণ খুশি বলকে কাছে রাখা যেতে পারে। আবার বল নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এক হাতেই বলকে বাউন্স করানো যায়। বলকে বাউন্স করতে করতে বিপক্ষকে কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

৫. **বাধা দেওয়া :** যখন বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় বলটাকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বা গোল করতে যাচ্ছে, তখন তাকে এমনভাবে বাধা দিতে হবে, যাতে সে বলটাকে নিজ দলের অপর খেলোয়াড়কে বা গোলপোস্টে ছুঁড়ে না দিতে পারে। তার জন্য একাকী বা দুই-তিনজনে একসাথে হাত তুলে প্রাচীর তৈরি করে বা শরীরের অংশ দিয়ে বাধা দিতে হবে।

কাজ–১ : গোলপোস্টে বল ছোড়ার কৌশলগুলো করে দেখাও।
কাজ–২ : পেনাল্টি থ্রো কেনো দেওয়া হয় ব্যাখ্যা কর।

পাঠ–৫ : হকি

ইতিহাস : যতদূর জানা যায় খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগে পারস্য দেশে হকি খেলার মতো এক প্রকার খেলার প্রচলন ছিল। ফ্রান্সের লোকেরা 'হকেট' নামে খেলা শুরু করেন। হকেট একটি ফরাসি শব্দ, যার অর্থ মেষপালকের লাঠি। আরও অনেক পরে ইংল্যান্ডের লোকেরা ফ্রান্সের কাছ থেকে এই খেলা শিখে হকে নাম দিয়ে খেলতে শুরু করে। ইংরেজি উচ্চারণ অনুযায়ী পরবর্তীতে এই খেলা হকি নামে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৪ সালে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন গঠিত হয়। অলিম্পিকে পুরুষদের হকি ১৯০৮ সালে এবং মহিলাদের হকি ১৯৮০ সালে প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথম বিশ্বকাপ হকি প্রতিযোগিতা শুরু হয় ১৯৭১ সালে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন গঠিত হয়।

আইনকানুন :

১. **দৈর্ঘ্য :** হকি খেলার মাঠের দৈর্ঘ্য ১০০ গজ এবং প্রস্থ ৬০ গজ।

২. **প্রস্থ :** মাঠের সকল রেখার প্রস্থ ৩ ইঞ্চি।

৩. **লাইন :** মাঠের বড় রেখাকে সাইড লাইন ও ছোট রেখাকে ব্যাক লাইন বলে।

৪. **শ্যুটিং সার্কেল :** ব্যাক লাইনের সমান্তরালে ১৬ গজ দূরে মাঠের মধ্যে ৪ গজ দৈর্ঘ্যের একটি রেখা টানতে হবে। এই রেখার দুই দিক থেকে টেনে ব্যাক লাইনের সাথে যুক্ত করে একটি অর্ধবৃত্ত আঁকতে হবে।

৫. **ফ্লাগ পোস্ট :** মাঠের প্রতি কর্নারে একটি করে ফ্লাগ পোস্ট থাকবে। ফ্লাগ পোস্টের উচ্চতা কমপক্ষে ৪ ফুট ও সর্বোচ্চ ৫ ফুট হবে।

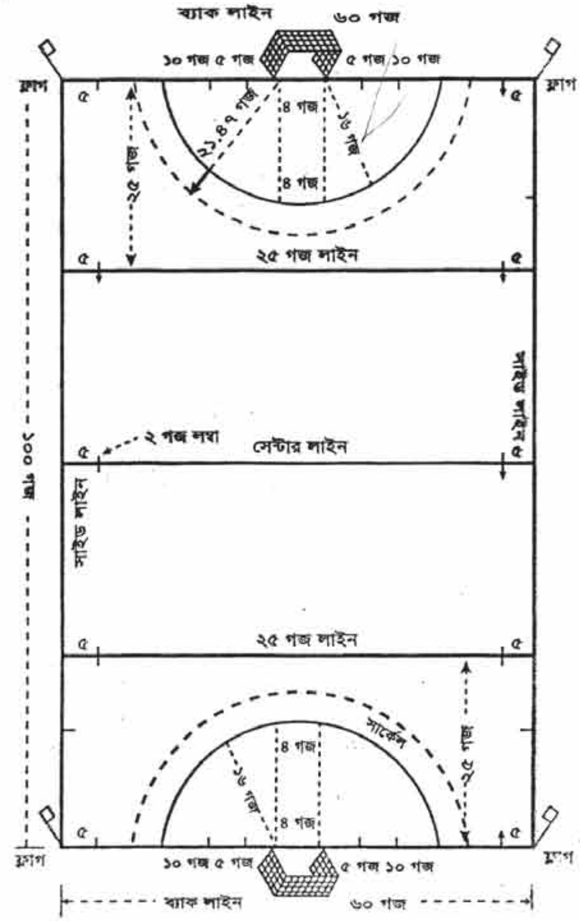

মাপসহ একটি আন্তর্জাতিক হকি খেলার মাঠ

৬. **গোলপোস্ট :** দুই খুঁটির ভিতরের দূরত্ব ৪ গজ এবং মাটির উপর থেকে ক্রসবারের নিচ পর্যন্ত উচ্চতা হলো ৭ ফুট। গোলপোস্ট ও ক্রসবারের রং হবে সাদা।

৭. **নেট :** নেট ক্রসবার, গোলপোস্ট, সাইড বোর্ড এবং ব্যাক বোর্ডের সাথে ঢিলা করে লাগানো থাকবে।

৮. **বল :** বলের ওজন ১৫৬ গ্রাম হতে ১৬৩ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। বলের রং হবে সাদা।

৯. **স্টিক :** ২ ইঞ্চি ব্যাসের একটি রিং স্টিকের ভিতর দিয়ে চলে এলে স্টিকটি বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

১০. **খেলোয়াড় :** প্রত্যেক দলে ১৬ জন খেলোয়াড় থাকবে। খেলা চলাকালীন ১১ জন মাঠে খেলবে বাকি খেলোয়াড়রা অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসাবে থাকবে।

১১. **আম্পায়ার :** দুজন আম্পায়ার খেলা পরিচালনা করেন।

১২. **খেলার সময় :** দুই অর্ধে খেলা হবে। প্রতি অর্ধের সময় ৩৫ মিনিট। অর্ধবিরতি ৫ হতে ১০ মিনিট।

১৩. **খেলা আরম্ভ :** সেন্টার পাসের মাধ্যমে হকি খেলা শুরু হয়। বলটি পুশ বা হিট করে সেন্টার পাস করতে হয়।

১৪. **অফসাইড :** হকি খেলায় অফসাইড হয় না।

১৫. **গোলকিপার :** গোলকিপার হাত দ্বারা বল থামাতে এবং ধরতে পারবে।

১৬. খেলোয়াড় যা করতে পারবে না–

ক. বল খেলার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে পিছনের দিকে স্টিক তোলা যাবে না ;

খ. বল খেলার সময় স্টিকের কোনো অংশ কাঁধের উপরে তোলা যাবে না ;

গ. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে হিট, হুক, চার্জ, স্টিক দিয়ে আঘাত করা যাবে না ;

ঘ. বিপক্ষ খেলোয়াড়ের হাত বা কাপড় ধরে রাখা যাবে না।

১৭. ফ্রি হিট প্রদান করা হবে–

ক. আক্রমণকারী খেলোয়াড় বিপক্ষের ২৫ গজ এলাকার মধ্যে আইন ভঙ্গ করলে ;

খ. রক্ষণকারী খেলোয়াড় তাদের শ্যুটিং সার্কেলের বাইরে ২৫ গজ এলাকার মধ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে আইন ভঙ্গ করলে ;

গ. ২৫ গজ এলাকার মধ্যে যেকোনো খেলোয়াড় যেকোনো ধরনের অপরাধ করলে।

১৮. ফ্রি হিট করার প্রক্রিয়া–

ক. বলটি অবশ্যই স্থির থাকবে ;

খ. সূচনাকারী বলটি পুশ অথবা হিট করতে পারবে ;

গ. বলটি ইচ্ছাকৃতভাবে উঠিয়ে খেলা যাবে না ;

ঘ. বিপক্ষ খেলোয়াড় বল হতে ৫ মিটার দূরত্বের ভিতরে অবস্থান করতে পারবে না।

১৯. পেনাল্টি কর্নার দেওয়া হয় : রক্ষণ দলের কোনো খেলোয়াড় ২৫ গজ (২৩ মিটার) লাইনের ভিতরে, তবে সার্কেলের বাইরে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো অপরাধ করলে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে সার্কেলের ভিতরে অপরাধ করলে পেনাল্টি কর্নার দেওয়া হয়।

২০. পেনাল্টি কর্নার মারার প্রক্রিয়া : ব্যাক লাইনের উপর ১০ গজের চিহ্নিত স্থান থেকে পেনাল্টি কর্নার মারতে হবে। এই সময় অন্য সকল খেলোয়াড় ৫ গজ দূরে অবস্থান করবে। রক্ষণ দলের ৫ জন খেলোয়াড় (গোলরক্ষকসহ) গোললাইন ও ব্যাক লাইন বরাবর দাঁড়াতে পারবে। যিনি পেনাল্টি কর্নার মারবেন, তার একটি পা মাঠের ভিতরে ও অন্য পা ব্যাক লাইনে রাখতে হবে।

২১. পেনাল্টি স্ট্রোক দেওয়া হয়–

ক. সার্কেলের ভিতরে বলটি যখন আক্রমণকারী খেলোয়াড়ের নিয়ন্ত্রণে তখন রক্ষণকারী খেলোয়াড় ইচ্ছাকৃত অপরাধের মাধ্যমে একটি সম্ভাব্য গোল প্রতিহত করলে ;

খ. সার্কেলের ভিতরে রক্ষণকারী খেলোয়াড় অনিচ্ছাকৃত অপরাধের মাধ্যমে একটি অবধারিত গোল প্রতিহত করলে ;

গ. পেনাল্টি কর্নার শুরুর পূর্বেই রক্ষণকারী খেলোয়াড় বারবার ব্যাক লাইন ছেড়ে বের হয়ে এলে।

২২. পেনাল্টি স্ট্রোক মারার প্রক্রিয়া : গোললাইন হতে মাঠের দিকে ৭ গজের চিহ্নিত স্থান হতে পেনাল্টি স্ট্রোক মারতে হবে। গোলকিপার ও স্ট্রোক গ্রহণকারী ছাড়া অন্যান্য খেলোয়াড় ২৫ গজ লাইনের বাইরে অবস্থান করবে। পেনাল্টি স্পট হতে পুশ, ফ্লিক অথবা স্কুপ করে বলটি খেলতে হবে।

কলাকৌশল : হকি খেলার মৌলিক কলাকৌশলগুলো নিম্নরূপ :

১. হিট, ২. স্টপিং, ৩. পুশ, ৪. ফ্লিক, ৫. স্কুপ, ৬. ড্রিবলিং

১. সোজা হিট : বল শরীরের বাম দিকে রেখে আইনসিদ্ধভাবে স্টিক দিয়ে সজোরে আঘাত করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পাঠানোকে সোজা হিট বলে। এ সময় বাম হাত দিয়ে স্টিকের উপরের অংশ ধরতে হবে। ডান হাত, বাম হাতের নিচে সংযুক্ত থাকবে। উভয় হাতের মধ্যে ফাঁক থাকবে না। দৃষ্টি বলের উপর থাকবে।

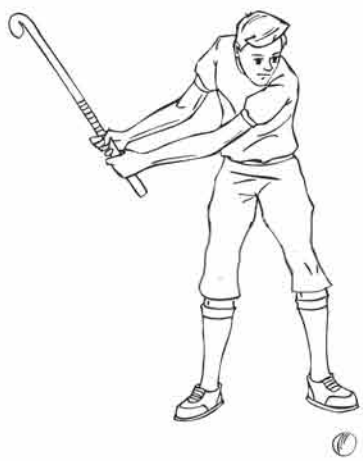

সোজা হিট

২. স্টপিং : আগত বল আয়ত্তে আনা এবং পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করার জন্য যে কৌশল প্রয়োগ করা হয়, তাকে স্টপিং বলে। এ সময় বাম হাত দিয়ে স্টিকের উপরিভাগ এবং ডান হাত দিয়ে মাঝামাঝি অংশ ধরতে হবে। স্টিকের সমতল অংশ বলের দিকে ফেরানো থাকবে। পদদ্বয় পৃথক ও পাশাপাশি অবস্থান করবে। শরীরের ভর পায়ের পাতার উপর থাকবে। বলের উপর দৃষ্টি থাকবে।

৩. পুশ : বলের সাথে স্টিক লাগিয়ে কোনো শব্দ না করে বলটি মাটি ঘেষে গড়িয়ে দেওয়াকে পুশ বলে। এ সময় বাম হাত দিয়ে স্টিকের উপরের অংশে ধরতে হবে। ডান হাতের সাহায্যে স্টিকের প্রায় মধ্যভাগে ধরবে। বাম পা সামনে এবং ডান পা পিছনে থাকবে। যারা বাম হাতে খেলবে তারা উল্টোভাবে ধরবে।

স্টপিং

৪. ফ্লিক : যখন একটি স্থির বা গড়ানো বল পুশ করা হয় এবং বলটি হাঁটু পর্যন্ত উপরে উঠে তখন তাকে ফ্লিক বলে।

৫. স্কুপ : একটি স্থির বা গতিহীন বলের নিচে স্টিক রেখে মাথার উপরের দিকে বল পাঠানোকে স্কুপ বলে।

৬. ড্রিবলিং : বলসহ সামনে এগিয়ে যাওয়াকে ড্রিবলিং বলে। বিপক্ষকে ধোঁকা দেওয়া এবং বিপক্ষের গোলপোস্টের দিকে বল এগিয়ে যাওয়ার জন্য ড্রিবলিং একটি কার্যকর কৌশল।

ড্রিবলিং

কাজ–১ : হকি খেলার কৌশলগুলো প্রদর্শন কর।

পাঠ – ৬: সাঁতার

ইতিহাস– বর্তমানে যে ধরনের সাঁতার আমরা দেখতে পাই, সে সাঁতার প্রথমে ইংরেজরা শুরু করে। সুইমিং শব্দ ইংরেজি সুইমিন থেকে এসেছে। ১৮৩৭ সালে লন্ডনে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক সাঁতার অনুষ্ঠিত হয়। অলিম্পিকে ১৮৯৬ সাল থেকে পুরুষদের ও ১৯১২ সাল থেকে মহিলাদের সাঁতার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯০৮ সালে সাঁতারের আন্তর্জাতিক সংস্থা FINA (Federation International de Nation Amateur) গঠিত হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। সাঁতারের সাহায্যে দেহের সকল অঙ্গের ব্যায়াম হয় বলে একে পূর্ণাঙ্গ ব্যায়াম বলা হয়। স্বাস্থ্য, জীবন রক্ষা, ক্রীড়া ও আনন্দের জন্য সকলের সাঁতার শেখা উচিত।

সাঁতার শেখার সহায়ক জিনিসপত্র : সাঁতার শেখার জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত জিনিসগুলো সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ক. জীবন রক্ষার জন্য বয়া খ. মোটরগাড়ির চাকার টিউব গ. কলাগাছ ঘ. শুকনো নারিকেল ঙ. ভাসমান কাঠ বা বাঁশ।

সাঁতার অনুশীলনের সময় সতর্কতা :

১. আবর্জনা ও বিপজ্জনক দ্রব্য মুক্ত করে সাঁতারের জায়গা নিরাপদ করা ;
২. অল্প পানি বা অগভীর জায়গা বেছে নেওয়া ;
৩. কেউ ডুবে গেলে তুলে আনতে পারে, এমন অভিজ্ঞ একজন সাঁতারুকে কাছে রাখা ;
৪. ভাসমান বস্তু কাছে রাখা ;
৫. আহার করার দেড় ঘণ্টার মধ্যে বা খালি পেটে সাঁতার অনুশীলন না করা ;
৬. সম্ভব হলে লাইফ বোট বা লাইফ জ্যাকেট কাছে রাখা ;
৭. লম্বা, মোটা ও শক্ত দড়ি বা বাঁশ কাছে রাখা ;
৮. পোশাক পরিবর্তনের কক্ষ ও বাথরুম ঠিক আছে কীনা পরীক্ষা করে নেওয়া ;
৯. কফ বা থুথু বাইরে ফেলার ব্যবস্থা রাখা।

প্রতিযোগিতামূলক সাঁতার চার প্রকার যথা :

ক. মুক্ত সাঁতার (Free Style)
খ. চিৎ সাঁতার (Back stroke)
গ. বুক সাঁতার (Breast stroke)
ঘ. প্রজাপতি সাঁতার (Butterfly)

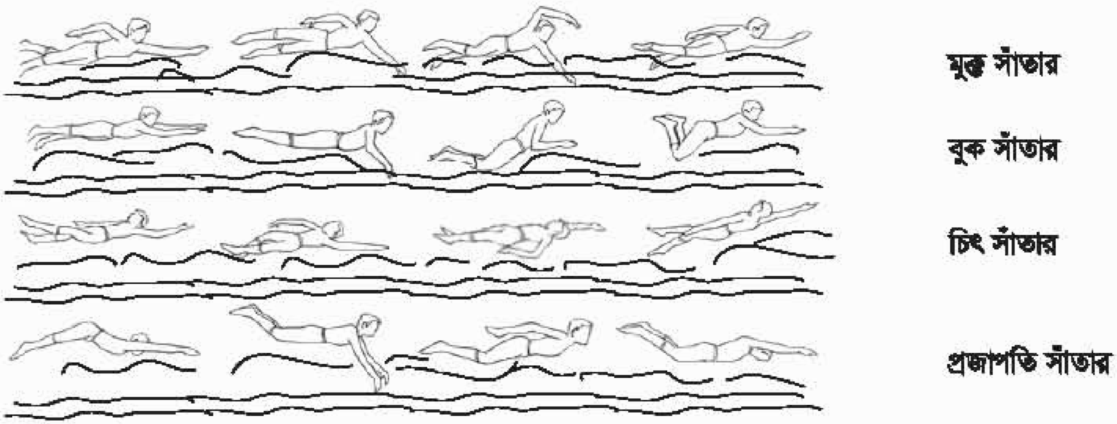

কলাকৌশল :

ক. মুক্ত সাঁতার (ফ্রি স্টাইল)– এ সাঁতারকে ফ্রন্ট ক্রল বা মুক্ত সাঁতার বলে। এ স্টাইলে খুব দ্রুত সাঁতার কাটা যায়।

দেহের অবস্থান : দেহটাকে উপুড় করে পানির সমান্তরাল রাখতে হবে। পানির মধ্যে মাথা মাঝে মাঝে পরিবর্তন করতে হয়- কখনো পানির উপর তুলে, আবার কখনো ঘাড়কে কাত করে। সাধারণত যারা কম দূরত্বের সাঁতার কাটে, তাদের মাথাটা একটু উপরের দিকে থাকে। আবার যারা মাঝারি বা লম্বা দূরত্বের সাঁতার কাটে তাদের মাথাটা নিচের দিকে থাকে।

মুক্ত সাঁতার

হাতের কাজ :

১. খাড়াভাবে হাতকে সোজা সামনে নিয়ে যেতে হবে ;
২. হাতকে সোজা শরীরের পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে পানির সমান্তরালে রেখে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ;
৩. যখন হাত মাথার সামনের পানি স্পর্শ করবে, ঠিক তখনি পানির ভিতর হাতের কাজ শুরু হবে ;
৪. হাত পানির ভিতর নিয়ে প্রথমে পানি টানতে হবে, পরে পিছনের দিকে ঠেলা দিতে হবে। এভাবে এক হাতের পর অন্য হাত অর্থাৎ ডান হাতের পর বাম হাতে পানি কেটে চলতে থাকবে।

পায়ের কাজ :

১. পায়ের কাজ কোমর থেকেই শুরু হয়। একের পর এক ডান পা ও বাম পা উঠা-নামা করে সামনে এগুবে ;
২. হাঁটুর কাছ থেকে পা ভাঁজ করতে হবে এবং পায়ের পাতা সোজা থাকবে ;
৩. পায়ের গোড়ালি পানির উপরে আসবে না। পায়ের পাতা দিয়ে যখন পানিতে চাপ দেবে তখন সেটা ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ পানির নিচে যাবে ;
৪. মনে রাখতে হবে, দুই হাতে একবার ঘুরে আসার মধ্যে ৬ থেকে ১২ বার পায়ের পরিচালনা করতে হবে।

শ্বাস–প্রশ্বাস : সাঁতার কাটার সময় মাথাটাকে ঘুরিয়ে পানির উপর মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া ও ছাড়া হয়। অর্থাৎ যে হাতটা পানির উপরে থাকবে, সেই দিকটায় মাথাটা ঘুরিয়ে নাক ও মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হবে এবং মাথাটা পানির ভিতরে যাওয়ার সাথে সাথে নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে। চিত্র দেখে কৌশল রপ্ত করতে চেষ্টা কর।

মুক্ত সাঁতারের নিয়মাবলি

১. মুক্ত সাঁতার আরম্ভ ব্লকে উঠে শুরু করতে হয় ;
২. মুক্ত সাঁতারে উপুড় হয়ে সাঁতার কাটতে হয় ;
৩. পা পানির নিচে সাধারণত ১২-১৮ ইঞ্চি পরিমাণে যায় ;

৪. অন্য প্রতিযোগীর লেনে গিয়ে বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না ;
৫. পানির নিচে দিয়ে সাঁতার কাটা যাবে না ;
৬. টার্নিংয়ের সময় শরীরের যেকোনো অংশ স্পর্শ করে টার্নিং নেওয়া যাবে ;
৭. সমাপ্তি যেকোনো অবস্থায় করা যাবে ;
৮. হাতের কাজ পানির নিচে S-এর মতো হবে।

চিৎ সাঁতার (ব্যাকস্ট্রোক)

দেহের অবস্থান : পানিতে শরীর চিৎ করে রাখতে হবে। সাধারণত মাথাটাকে পানির ভিতর রাখতে হয়। যাতে সম্পূর্ণ শরীরটা পানির উপর সমান্তরাল থাকে- যেন মাথাটা বালিশে রাখা আছে। দৃষ্টি পায়ের গোড়ালির দিকে রাখতে হবে।

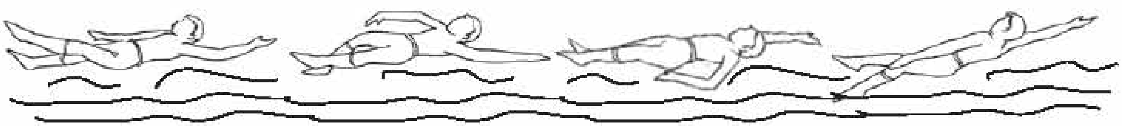

চিৎ সাঁতার

হাতের কাজ : হাত দুটো সোজাসুজি মাথার কাছাকাছি পানির ভিতর নিয়ে যেতে হবে। চিৎ সাঁতারে হাতের অবস্থান হবে এক এক করে। একহাত পানিতে পড়বে ও অপর হাত উপরে উঠবে এবং অন্য হাত পানিতে পড়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

পায়ের কাজ : মুক্ত সাঁতারের মতোই অনেকটা পায়ের কাজ হয়। সাধারণত চিৎ হয়ে ফুটবল কিক মারার মতোই পায়ের কাজ।

শ্বাস–প্রশ্বাস : শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিকভাবে নিতে হবে।

চিৎ সাঁতারের নিয়মাবলি :

১. চিৎ সাঁতার পানিতে নেমে হাতল ধরে আরম্ভ করতে হয়;
২. চিৎ সাঁতার চিৎ হয়ে কাটতে হয় ;
৩. পা পানির নিচে সাধারণত ১৮-২৪ ইঞ্চি যায় ;
৪. সাঁতারের সময় অন্যের লেনে যাওয়া যাবে না ;
৫. চিৎ সাঁতারে পায়ের কিক হবে কোমর থেকে ;
৬. এই সাঁতারে শরীরের যেকোনো অংশ দিয়ে ঘূর্ণন করা যাবে। তবে চিৎ অবস্থায় ;
৭. এই সাঁতারে শরীরের যেকোনো অংশ স্পর্শ করে সাঁতার সমাপ্ত করা যাবে, তবে চিৎ অবস্থায়।

বুক সাঁতার (ব্রেস্ট স্ট্রোক) :

দেহের অবস্থান : বুক সাঁতার কাটার সময় দেহটাকে প্রায় পানির সমান্তরালে রাখতে হয়। পিছনের অংশ পানির সমান্তরাল থেকে ১০ ডিগ্রির মতো পানির নিচের দিকে থাকে।

বুক সাঁতার

হাতের কাজ : দুই হাত পানির মধ্যে একসঙ্গে নিতে হবে। হাতের তালু একটু নিচে ও বাইরের দিকে রাখতে হয়। কনুই ভেঙে দুই হাত দিয়ে নিচের দিকে চাপ দিতে হয় এবং হাত দুটো বুকের সামনে আসার সাথে সাথে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হয়। হাত চালানো অনেকটা হৃৎপিন্ডের আকারের মতো হয়। ঘোরা (টার্নিং) এবং সাঁতার শেষ করার (ফিনিশিং) সময় দুই হাত দিয়ে একই সাথে দেয়াল স্পর্শ করতে হবে।

পায়ের কাজ : দুপা দিয়ে হাঁটু ভেঙে পানিতে ব্যাঙের মতো পিছনের দিকে লাথি মারতে হয়। পায়ের পাতা বাইরের দিকে রাখতে হবে।

শ্বাস–প্রশ্বাস : মাথা সামনে তুলে শ্বাস নিতে হয় এবং পানির ভিতরে শ্বাস ছাড়তে হয়।

বুক সাঁতারের নিয়মাবলি :

১. 'ডাইভ' দিয়ে সাঁতার আরম্ভ করতে হবে ;

২. 'টার্নিং ও ফিনিশিং'-এর সময় একসাথে দুই হাত দিয়ে সমাপ্তি ওয়াল স্পর্শ করতে হবে ;

৩. সাঁতারের পূর্ণ সময় বুকের উপর শরীরের ভার থাকবে ;

৪. অন্য প্রতিযোগীর লেনে গিয়ে বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না ;

৫. পানির নিচ দিয়ে সাঁতার দেওয়া যাবে না ;

৬. পা উপরে-নিচে তুলে সাঁতরানো যাবে না ;

৭. উভয় হাত ও উভয় পা একই সময় এবং একই কায়দায় সঞ্চালন করতে হবে।

প্রজাপতি সাঁতার (বাটারফ্লাই)

দেহের অবস্থান : এই সাঁতারে শরীর খুব দ্রুত উঠানামা করে। পা দ্বারা যখন নিচের দিকে লাথি মারা হয় কোমর তখন উপরের দিকে উঠে আসে। পুনরায় পানি টানার জন্য হাতকে যখন প্রস্তুত করা হয়, তখন মাথা ও ঘাড় পানির নিচে চলে যায়। আবার যখন হাত দ্বারা পানি টানা হয় তখন ঘাড় ও মাথা পানির উপর দিকে জেগে উঠে। দুই পা জোড়া করে একই সাথে হাতকে প্রসারিত করতে হয়। মাথা উপরে থাকা অবস্থায় শ্বাস নিতে হয়।

প্রজাপতি সাঁতার

হাতের কাজ : প্রজাপতি সাঁতারে হাতের কাজ হবে একসাথে। পানির উপরে হোক আর নিচে হোক, হাতকে আগে-পরে করা যাবে না। হাতের কনুইকে বাঁকা এবং উঁচু করে নিচের দিকে এবং বাহিরমুখী করে পানিতে চাপ দিতে হবে। হাত মাথা বরাবর সোজা রাখতে হবে। বুকের দুই পাশ থেকে শরীর ঘুরিয়ে বুকের নিচে হাতকে নিয়ে আসতে হবে। পানির নিচে হাতকে কোমর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে।

পায়ের কাজ : প্রজাপতি সাঁতারে পায়ের অবস্থান হবে ডলফিন কিকের মতো। দুই পা কোনো অবস্থাতেই আগে পরে হলে চলবে না, পা একসাথেই উঠানামা করতে হবে। শরীর শোয়ানো অবস্থায় পা দুটো একত্রে সোজা করে রাখতে হবে। সাঁতারুকে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় কাঁধের উপর ভর করে ঢেউ খেলানোর ভঙ্গিতে পা সামনের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

শ্বাস–প্রশ্বাস : প্রজাপতি সাঁতারে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের কাজে মাথা সামনে ও পাশে উভয় দিকে করা গেলেও বিশ্বখ্যাত সাঁতারুরা সামনের দিকেই শ্বাস গ্রহণ করে থাকে। মাথাকে উপরে তোলা অবস্থায় মুখ দিয়ে শ্বাস গ্রহণ করতে হয়। আর এটাই সহজতর। শ্বাস গ্রহণের সময় ঘাড় নমনীয় থাকবে।

প্রজাপতি সাঁতারের নিয়মাবলি :

১. প্রজাপতি সাঁতার আরম্ভ ব্লকে উঠে ঝাঁপ দিয়ে শুরু করতে হয় ;

২. এই সাঁতার বুকের উপর ভর করে কাটতে হয় ;

৩. লেন পরিবর্তন করা যাবে না ;

৪. পায়ের পাতা দিয়ে কিক মারতে হবে ;

৫. প্রতি স্ট্রোকে নিঃশ্বাস না নিলেও চলবে ;

৬. হাত কোমরের পিছনে যেতে পারে ;

৭. টার্নিংয়ের সময় দুই হাত দিয়ে একসাথে ওয়াল স্পর্শ করতে হবে ;

৮. সমাপ্তি রেখায় দুই হাত একসাথে স্পর্শ করতে হবে।

মিডলে রিলে : মিডলে সাঁতার দুই প্রকার– ব্যক্তিগত মিডলে ও দলগত মিডলে।

ব্যক্তিগত মিডলে সাঁতারে একজন সাঁতারুকে ৪টি স্টাইলে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিচের স্টাইলসমূহ ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হবে–

প্রজাপতি সাঁতার ⟶ চিৎ সাঁতার ⟶ বুক সাঁতার ⟶ মুক্ত সাঁতার

দলগত মিডলে সাঁতারে চারজন সাঁতারুকে ৪টি স্টাইলের নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়।
পর্যায়ক্রমিকভাবে স্টাইলের নাম দেওয়া হলো-

চিৎ সাঁতার ⟶ বুক সাঁতার ⟶ প্রজাপতি সাঁতার ⟶ মুক্ত সাঁতার

বিভিন্ন দূরত্বের বিভিন্ন স্টাইলের সাঁতারে ভালো করার জন্য ছেলেমেয়ে উভয়কে নিচে বর্ণিত দিকগুলোর প্রতি ভালোভাবে লক্ষ রাখতে হবে।

১. সাঁতারের প্রত্যেক ফ্রি স্টাইলে হাত-পায়ের সঞ্চালন ও শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া এবং এর সমন্বয় পদ্ধতি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে।

২. প্রত্যেকটি সাঁতার স্টাইলে শুধু হাতের বা শুধু পায়ের সাহায্যে অনুশীলন করে হাত ও পায়ের শক্তি এবং দক্ষতা বাড়াতে হবে।

কাজ-১ : মুক্ত সাঁতারের কৌশল উল্লেখ করে পানিতে মুক্ত সাঁতার করে দেখাও।

কাজ-২ : বুক সাঁতার কীভাবে করতে হয় তা পানিতে প্রদর্শন কর।

কাজ-৩ : প্রজাপতি সাঁতারের কৌশল ব্যাখ্যা করে পানিতে তা প্রয়োগ করে দেখাও।

বি:দ্র:- কোনো মাদরাসায় পুকুর না থাকলে নিচু বেঞ্চে শুয়ে সাঁতার প্রদর্শন কর।

পাঠ–৭ : অ্যাথলেটিকস

ইতিহাস– পৃথিবীতে যত প্রকার খেলাধুলা আছে, তার মধ্যে দৌড়, লাফ-ঝাঁপ ও নিক্ষেপই সবচেয়ে প্রাচীন। আদিম যুগে মানুষকে বাঁচার জন্য শিকার বা প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে দৌড় দিয়ে, বাধা অতিক্রমের জন্য লাফ দিয়ে, শিকার বা শত্রুকে ঘায়েল করতে নিক্ষেপের সাহায্য নিতে হতো। পরবর্তীতে মানবসভ্যতার ক্রমবিবর্তনে এই দৌড়, ঝাঁপ ও নিক্ষেপ ক্রীড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। একই সাথে আবদ্ধ হয়েছে নিয়মকানুনের বেড়াজালে। দৌড়, ঝাঁপ, নিক্ষেপ এখন অ্যাথলেটিকস নামে অভিহিত। প্রাচীন গ্রিসে জিউস দেবতার সম্মানে অলিম্পিয়া পর্বতের নামানুসারে অ্যাথলেটিকসকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ৭৭৬ খ্রি: পূর্বাব্দে গ্রিসে প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৯৬ সালে গ্রিসের রাজা কর্তৃক আধুনিক অলিম্পিক প্রতিযোগিতা গ্রীসে পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১২ সালে ইন্টারন্যাশনাল অ্যামেচার অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন (I.A.A.F) এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশন গঠিত হয়।

নিয়মকানুন :

অ্যাথলেটিকসকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ক. ট্র্যাক ইভেন্ট খ. ফিল্ড ইভেন্ট।

ক. ট্র্যাক ইভেন্ট- সকল প্রকার দৌড় ও হাঁটা।

খ. ফিল্ড ইভেন্ট- সকল প্রকার লাফ ও নিক্ষেপ।

ক. ট্র্যাক ইভেন্টকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়–

১. স্বল্প দূরত্বের দৌড়। একে স্প্রিন্ট (Sprint) বলে।

২. মধ্যম দূরত্বের দৌড়।

৩. দীর্ঘ দূরত্বের দৌড়।

স্বল্প দূরত্বের দৌড় : ১০০ মিটার স্প্রিন্ট, ২০০ মিটার স্প্রিন্ট, ৪০০ মিটার স্প্রিন্ট, ১০০ মিটার হার্ডেল (মহিলা), ১১০ মিটার হার্ডেল (পুরুষ), ৪ × ১০০ মিটার রিলে, ৪০০ মিটার হার্ডেল।

মধ্যম দূরত্বের দৌড় : ৮০০ মিটার দৌড়, ১৫০০ মিটার দৌড়, ৪ × ৪০০ মিটার রিলে।

দীর্ঘ দূরত্বের দৌড় : ৩০০০ মিটার স্টিপল চেজ (পুরুষ), ৫০০০ মিটার দৌড়, ১০০০০ মিটার দৌড়, ম্যারাথন দৌড়, ২০ কিলোমিটার হাঁটা, ৫০ কিলোমিটার হাঁটা (পুরুষ)।

খ. ফিল্ড ইভেন্ট : লাফ ও নিক্ষেপ বিভাগের ইভেন্টসমূহকে ফিল্ড ইভেন্ট বলে।

১. লাফ বিভাগ : দীর্ঘ লাফ, উচ্চ লাফ, ত্রি-লাফ (ট্রিপল জাম্প) ও পোলভল্ট।

২. নিক্ষেপ বিভাগ : গোলক নিক্ষেপ, চাকতি নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ ও হাতুড়ি নিক্ষেপ।

দৌড় আরম্ভ : যার সংকেতে ইভেন্ট শুরু হয়, তাকে আরম্ভকারী বলে। স্প্রিন্ট আরম্ভের সময় আরম্ভকারী বলবেন- অন ইওর মার্ক, সেট, বাঁশির শব্দ (on your mark, set, fire)। মধ্যম ও দীর্ঘ দূরত্বে দৌড়ের সময় তিনি বলবেন- অন ইওর মার্ক, বাঁশির শব্দ। একজন প্রতিযোগী একবারও ফলস স্টার্ট নিতে পারে না। নিলে অযোগ্য বলে গণ্য হবে।

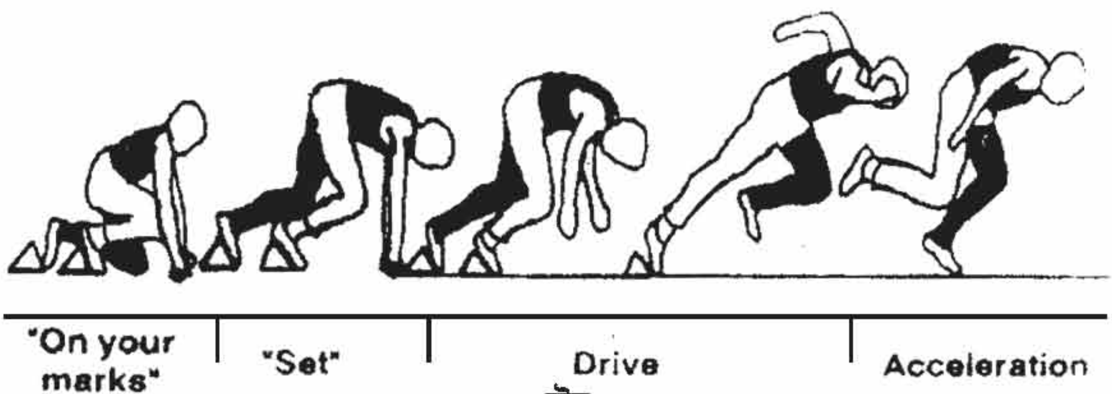

দৌড়

দৌড়ের সমাপ্তি : সকল দৌড়ের সমাপ্তি একই রেখায় হবে। শেষ রেখায় টর্সো (Torso) স্পর্শ করার পর্যায়ক্রমিক ধারায় প্রতিযোগীদের মধ্যে স্থান নির্ধারিত হবে। নাভি থেকে গলকণ্ঠ পর্যন্ত শরীরের অংশকে টর্সো বলে।

কাজ : ১– বিদ্যালয়ের মাঠে বিভিন্ন দৌড় অনুশীলন কর।

পাঠ–৮ : গোলক, চাকতি ও বর্শা নিক্ষেপ

গোলক নিক্ষেপ : যদি প্রতিযোগী ৮ জন বা তার কম হয়, সেক্ষেত্রে ৬টি করে নিক্ষেপ করার সুযোগ পাবে। যদি ৮ জনের অধিক হয়, সেক্ষেত্রে প্রত্যেকে তিনটি করে নিক্ষেপ করবে, সেখান থেকে ৮ জনকে বাছাই করে উক্ত ৮ জন আরও তিনটি নিক্ষেপ করার সুযোগ পাবে। একই নিয়ম চাকতি ও বর্শা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

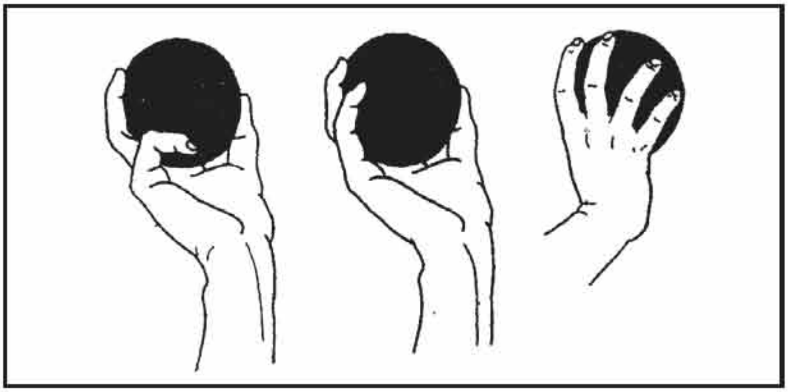

শটপুট ধরা

গোলক ধরার কৌশল :

ক. শটপুটকে প্রথমে বিপরীত হাতের তালুতে রাখতে হবে ;

খ. যে হাত দিয়ে নিক্ষেপ করবে, সে হাত দিয়ে ধরতে হবে ;

গ. ধরার সময় শটপুটটা রাখতে হবে আঙ্গুলের Base-এর সাথে স্পর্শ করে ;

ঘ. নিক্ষেপ করার সময় সাপোর্ট থাকবে বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠ আঙ্গুলের এবং শক্তি থাকবে অন্য তিন আঙ্গুলের উপরে।

একজন নিক্ষেপকারীর একটি সুযোগ নষ্ট হবে :

ক. বৃত্তের বাইরে থেকে পদক্ষেপ নিয়ে ভিতরে এসে নিক্ষেপ করলে ;

খ. গোলকটি সেক্টর লাইনের দাগ স্পর্শ বা বাইরে পড়লে ;

গ. নিক্ষেপের সময় নিক্ষেপকারী বৃত্তের বাইরের ভূমি স্পর্শ করলে ;

ঘ. স্টপ বোর্ডের উপরিভাগ স্পর্শ করলে ;

ঙ. নিক্ষেপকারী বৃত্তের সামনের অংশ দিয়ে বের হলে ;

চ. নাম ডাকার ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে নিক্ষেপ না করলে।

শটপুট নিক্ষেপ

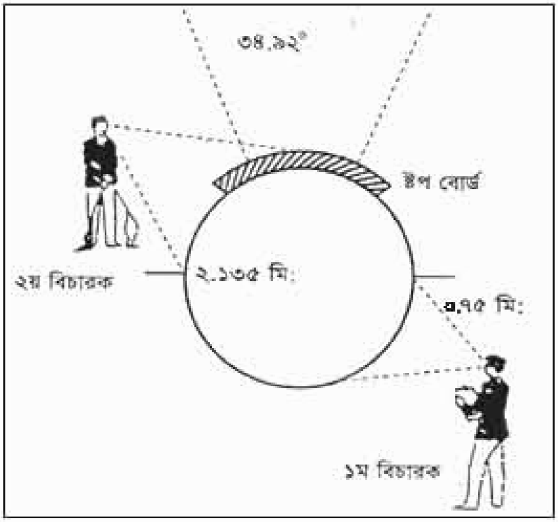

শটপুট সার্কেল ও সেক্টর

শটপুট সার্কেল : বৃত্তের ব্যাস দাগের ভিতর পর্যন্ত ২.১৩৫ মি। বৃত্তের মাঝ বরাবর উভয় পার্শ্বে ০.৭৫ মি বাড়ানো থাকবে। কোণ ৩৪.৯২ ডিগ্রি। বৃত্তের ভিতর হবে মসৃণ, যাতে প্রতিযোগীদের ঘুরতে সুবিধা হয়।

গোলক নিক্ষেপের স্টপ বোর্ড : গোলক নিক্ষেপের জন্য একটি কাঠের স্টপ বোর্ড থাকবে।

চাকতি নিক্ষেপ :

চাকতি ধরার কৌশল :

ক. প্রথমে বিপরীত হাতে চাকতি রাখতে হবে ;

খ. মসৃণ পিঠ উপরে থাকবে ;

গ. যে হাতে নিক্ষেপ করা হবে, সে হাতের মাধ্যমে তিন আঙুলের প্রথম ভাঁজে চাকতি আঁকড়িয়ে ধরতে হবে ;

ঘ. আঙুলগুলো ফাঁকা করে রাখতে হবে।

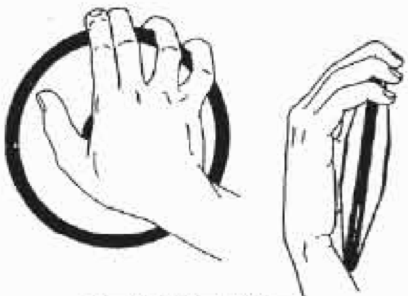

চাকতি ধরার কৌশল

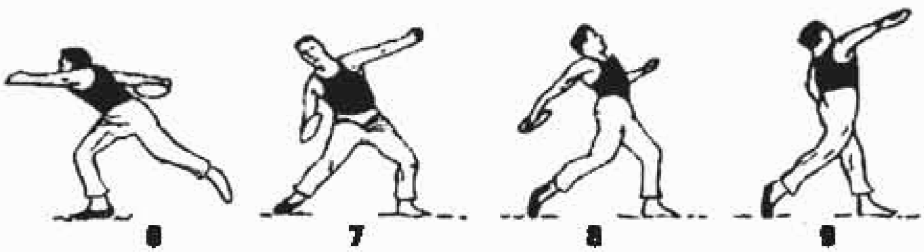

চাকতি নিক্ষেপ

চাকতি নিক্ষেপটি কখন অকৃতকার্য বলে ধরা হয় :

ক. চাকতিটি সেক্টর লাইন স্পর্শ করলে বা বাইরে পড়লে ;

খ. নিক্ষেপকারী নিক্ষেপের সময় বৃত্তের বাহিরের ভূমি স্পর্শ করলে ;

গ. নিক্ষেপের পর নিক্ষেপকারী বৃত্তের সামনের অংশ দিয়ে বের হলে ;

ঘ. লোহার পাতের উপরের অংশে স্পর্শ করলে;

ঙ. বৃত্তের ভিতর থেকে নিক্ষেপ না করলে ;

চ. নাম ডাকার ৬০ সেকেন্ডের ভিতর নিক্ষেপ না করলে।

বর্শা নিক্ষেপ : বর্শাটি অবশ্যই হাত দিয়ে কাঁধের উপর থেকে নিক্ষেপ করতে হবে। নিক্ষেপের সময় বর্শাটি হাত থেকে মুক্ত হওয়ার পর প্রতিযোগী নিক্ষেপ এলাকার মধ্যে শরীরের সম্পূর্ণ অংশ পিছনের দিকে ঘুরাতে পারবে। বর্শাটি নিক্ষেপের পর যতক্ষণ না মাটি স্পর্শ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিযোগী রানওয়ে ত্যাগ করতে পারবে না।

বর্শা নিক্ষেপ

বর্শা নিক্ষেপটি অকৃতকার্য হিসেবে গণ্য হবে–

ক. সেক্টর লাইন স্পর্শ করলে বা বাইরে পড়লে ;

খ. বর্শার মাথা প্রথমে আঘাত না করে শরীর আগে মাটি স্পর্শ করলে ;

গ. আর্কের দাগ স্পর্শ করে নিক্ষেপ করলে ;

ঘ. রানওয়ের নির্দিষ্ট রেখার বাইরের ভূমি স্পর্শ করে নিক্ষেপ করলে ;

ঙ. নিক্ষেপের পর পার্শ্বের বাড়ানো রেখা অতিক্রম করলে ;

চ. নাম ডাকার ৬০ সেকেন্ডের মধ্য নিক্ষেপ করতে ব্যর্থ হলে।

পাঠ–৯ : দীর্ঘ লাফ ও উচ্চ লাফ

দীর্ঘ লাফ : প্রতিযোগিতার সময় ৮ জনের বেশি প্রতিযোগী লাফে অংশগ্রহণ করলে সকল প্রতিযোগীদের ৩টি লাফের সুযোগ দিতে হবে। দূরত্বের ক্রম অনুসারে প্রথম ৮ জনকে বাছাই করে তাদেরকে পুনরায় আরও ৩টি লাফের সুযোগ দিতে হবে। ৮ জন বা তার কম প্রতিযোগী লাফে অংশগ্রহণ করলে, সকল প্রতিযোগীকে ৬টি করে লাফ দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

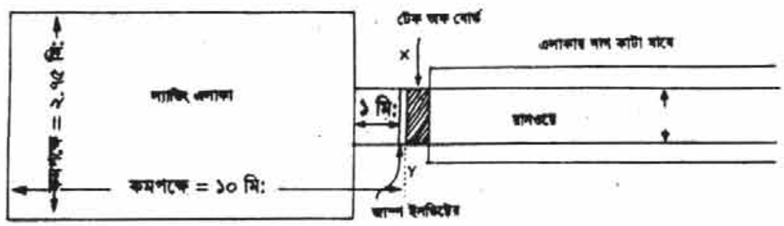

ল্যান্ডিং এলাকা ও রানওয়ে।

দীর্ঘ লাফ ল্যান্ডিং এলাকা

দীর্ঘলাফ

একজন প্রতিযোগী দীর্ঘ লাফে কখন একটি সুযোগ হারায়–

ক. প্রতিযোগী টেক অফ বোর্ডের সামনের ভূমি স্পর্শ করলে ;

খ. টেক অফ বোর্ডের বাইরে দিয়ে লাফ দিলে ;

গ. ল্যান্ডিংয়ের পূর্বে ল্যান্ডিং এরিয়ার বাইরের মাটি স্পর্শ করলে ;

ঘ. লাফ শেষ করার পর পিছনের দিকে হেঁটে আসলে ;

ঙ. সামার সল্ট বা দুই পায়ে টেক অফ দিয়ে লাফ দিলে ;

চ. নাম ডাকার ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে লাফ দিতে ব্যর্থ হলে।

উচ্চ লাফ : উচ্চ লাফ শুরু করার পূর্বে প্রতিযোগীদের লাফের উচ্চতা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। প্রতি রাউন্ড শেষে কী পরিমাণ উচ্চতা বাড়ানো হবে সেই উচ্চতাও ঘোষণা করতে হবে। প্রতি রাউন্ড শেষে ক্রসবার অবশ্যই কমপক্ষে ২ সেন্টিমিটার উপরে উঠাতে হবে। প্রতিযোগীকে অবশ্যই এক পায়ে 'টেক অফ' নিতে হবে। একই উচ্চতায় একজন প্রতিযোগী পরপর ৩ বার ব্যর্থ হলে সে পরবর্তী উচ্চতায় লাফ দিতে পারবে না। (ব্যতিক্রম শুধু প্রথম স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে)।

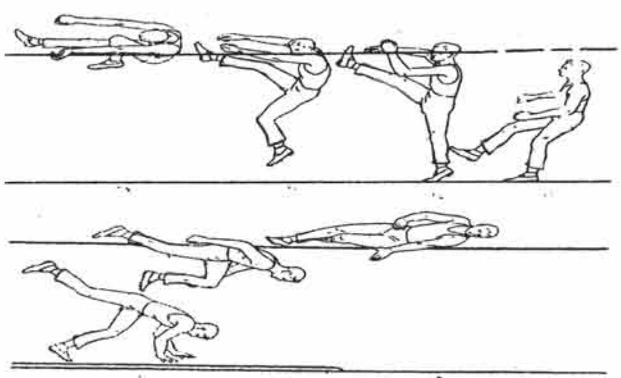

উচ্চ লাফ

একজন প্রতিযোগী উচ্চ লাফে একটি সুযোগ হারায়–

ক. নাম ডাকার ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে লাফ দিতে ব্যর্থ হলে ;

খ. জাম্প করার সময় ক্রসবার পড়ে গেলে ;

গ. জাম্প করতে এসে জাম্প না করে ক্রসবারের নিচ দিয়ে অতিক্রম করলে ;

ঘ. দুই পার্শ্বের স্ট্যান্ডের বাইরে শরীরের অংশ চলে গেলে।

টাই : টাই অর্থ সমতা বা সমান। যখন একাধিক প্রতিযোগী একই উচ্চতা বা একই দূরত্ব অতিক্রম করে, তখন টাই হয়। টাই শুধু প্রথম স্থান নির্ধারণের জন্য করতে হয়। ২য় ও ৩য় স্থান যৌথভাবে দেওয়া হয়।

উচ্চতায় টাই হলে টাই ভাঙার নিয়ম :

ক. যে উচ্চতায় টাই হয়েছে, সে উচ্চতায় যে কম চেষ্টায় অতিক্রম করেছে সে প্রথম হবে ;

খ. উপরের নিয়মে টাই না ভাঙলে ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত যার ক্রস কম সে ১ম হবে ;

গ. এরপরেও যদি টাই না ভাঙে তাহলে উচ্চতা বাড়িয়ে বা কমিয়ে লাফ দেওয়াতে হবে, যে অতিক্রম করবে সে বিজয়ী হবে। এখানে প্রতিযোগীগণ ১টি করে লাফের সুযোগ পাবে।

দূরত্বের টাই হলে টাই ভাঙার নিয়ম :

ক. মোট নিক্ষেপ বা লাফের ভিতর ২য় সর্বোচ্চ দূরত্ব দেখতে হবে।

খ. এ নিয়মে টাই না ভাঙলে ৩য় সর্বোচ্চ দূরত্ব দেখতে হবে। (এভাবে ক্রমান্বয়ে যাবে) নিম্নে ছক এঁকে বুঝানো হলো- (দীর্ঘ লাফ)

ছক

প্রতিযোগী	উচ্চতা						স্থান
	১ম লাফ	২য় লাফ	৩য় লাফ	৪র্থ লাফ	৫ম লাফ	৬ষ্ঠ লাফ	
ক	৭.০২	৭.১৫	–	৭.১০	৭.৩৫	৭.৪০	৩য়
খ	৬.১০	৬.৫০	৬.৬০	৭.০৫	৭.১০	৭.১২	৪র্থ
গ	৭.৫০	–	–	৭.৪৫	৭.৫৫	৭.৬০	১ম
ঘ	–	৭.৩০	৭.৪০	৭.৬০	–	৭.৫০	২য়

এখানে দেখা যাচ্ছে, গ ও ঘ দুজনেই ৭.৬০ মি. দূরত্ব অতিক্রম করেছে। সূত্রমতে, এখন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দূরত্ব দেখতে হবে। গ-এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দূরত্ব হলো ৭.৫৫ মি. ও ঘ-এর ৭.৫০ মি., সুতরাং গ ১ম ও ঘ ২য় এবং ক ৩য়।

দীর্ঘলাফ, ট্রিপলস্টেপ এন্ড জাম্প, শটপুট, চাকতি, হ্যামার ও বর্শা নিক্ষেপের টাই হলে সব টাই ভাঙার নিয়ম একই।

কাজ–১ : গোলক ধরার কৌশল প্রদর্শন কর।

কাজ–২ : কী কী কারণে দীর্ঘ লাফে একজন প্রতিযোগী একটি সুযোগ হারায় তা ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলনী

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. ভায়োলেশন কোন খেলার সাথে সম্পৃক্ত?

ক. ভলিবল　　গ. বাস্কেটবল

খ. হ্যান্ডবল　　ঘ. ফুটবল

২. লে–আপ শুট কোন খেলার একটি কৌশল?

ক. ভলিবল　　গ. বাস্কেটবল

খ. হ্যান্ডবল　　ঘ. ফুটবল

৩. দৌড়ের ক্ষেত্রে সমাপ্তি রেখায় কোনটি স্পর্শ করতে হয়?

ক. হাত　　গ. টর্সো

খ. পা　　ঘ. কপাল

৪. সাঁতারের আন্তর্জাতিক সংস্থার নাম কোনটি?

ক. FIFA
গ. FINA
খ. BHF
ঘ. IHF

৫. কোন সাঁতারে হাতের কাজ ইংরেজি 'S' বর্ণের মতো?

ক. মুক্ত
গ. চিৎ
খ. প্রজাপতি
ঘ. বুক

৬. গোলক নিক্ষেপে একজন প্রতিযোগী সুযোগ হারাবে যদি–

i. স্টপ বোর্ডের উপরিভাগ স্পর্শ করে
ii. বৃত্তের সামনের অংশ দিয়ে বের হয়
iii. নাম ডাকার ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে গোলক নিক্ষেপ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
গ. ii ও iii
খ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

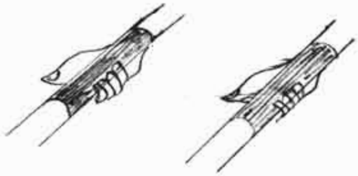

৭. উপরের চিত্রটি কোন খেলার ইঙ্গিত বহন করে?

ক. জেভলিন
গ. শটপুট
খ. পোলভল্ট
ঘ. ট্রিপল জাম্প

৮. উক্ত খেলায় একজন প্রতিযোগী অকৃতকার্য হওয়ার কারন–

i. সেক্টর লাইন স্পর্শ বা বাইরে যাওয়া
ii. আর্কের দাগ স্পর্শ করা
iii. রানওয়ের নির্দিষ্ট রেখার বাইরের ভূমি স্পর্শ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
গ. i ও iii
খ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

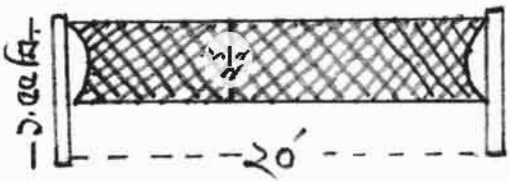

৯. উল্লেখিত চিত্রটি কোন খেলার সাথে সম্পৃক্ত?

ক. লন টেনিস　　গ. টেবিল টেনিস

খ. ব্যাডমিন্টন　　ঘ. ভলিবল

১০. উক্ত খেলা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হলে প্রয়োজন–

i. হাতের নমনীয়তা

ii. সঠিক গ্রিপ

iii. ভালো ফুটওয়ার্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii

গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১ ও ১২ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

A, B ও C তিন ধরনের খেলার মাঠের আকার

A	B	C
দৈর্ঘ্য–১০০ গজ প্রস্থ– ৬০ গজ	দৈর্ঘ্য– ৪৪ ফুট প্রস্থ – ১৭ ফুট	দৈর্ঘ্য– ৪৪ ফুট প্রস্থ – ২০ ফুট

১১. A চিহ্নিত চিত্রটি কোন খেলার মাঠকে নির্দেশ করে?

ক. ব্যাডমিন্টন　　গ. বাস্কেটবল

খ. হ্যান্ডবল　　ঘ. হকি

১২. নিচের কোন কৌশলটি B ও C উভয় মাঠের জন্য প্রযোজ্য?

ক. ড্রিবলিং　　গ. স্ম্যাশ

খ. লে–আপ শুট　　ঘ. সার্ভিস

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

খেলার ধরণ	তালিকাভুক্ত খেলোয়াড় সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় সংখ্যা
A	১৬	১১
B	১২	৭

১৩. চিত্রে 'B' কোন খেলাকে নির্দেশ করে?

ক. ব্যাডমিন্টন
খ. হ্যান্ডবল
গ. বাস্কেটবল
ঘ. হকি

১৪. কোন কৌশলটির প্রয়োগ হকি ও বাস্কেটবল উভয় খেলায় দেখা যায়?

ক. স্ম্যাশ
খ. সার্ভিস
গ. লে–আপ শুট
ঘ. ড্রিবলিং

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধা একজন শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে–ব্যাখা কর।
২. জীবন রক্ষার জন্য সাঁতার জানা অপরিহার্য–ব্যাখ্যা কর।
৩. ভালো হকি খেলোয়াড় হতে হলে স্টপিং ও ড্রিবলিং আয়ত্ব করার বিকল্প নেই – মতামত দাও।
৪. দ্রুতগতির ফুটওয়ার্কই ভালো ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হওয়ার পূর্বশর্ত–ব্যাখ্যা কর।
৫. বাস্কেটবল খেলতে হলে ভায়োলেশন সম্পর্কে জানতে হবে–মতামত দাও।
৬. ফলস্ স্টার্ট একজন ক্রীড়াবিদকে প্রতিযোগিতার অযোগ্য করে তোলে–ব্যাখ্যা কর।

সমাপ্ত

স্বাধীনতার
৫০
বছর
উন্নয়ন আমারও

বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপ জয়

২০২০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল প্রথমবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এই জয় বাংলাদেশের ক্রিকেটে একটি স্মরণীয় সাফল্য। আকবর আলির অধিনায়কত্বে ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে এই শিরোপা অর্জন করে বাংলাদেশ দল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উচ্ছ্বসিত হয়ে জয়ী দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং এই জয়কে মুজিববর্ষে জাতির জন্য সেরা উপহার হিসেবে অভিহিত করেছেন।

২০২৩
শিক্ষাবর্ষ
দাখিল
৮ম-শারীরিক শিক্ষা

শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শিক্ষার কোনো বয়স নেই

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য